পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

এবং

রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১৭

প্রদান উপলক্ষ্যে

স্মা র ক গ্র ন্থ

২০১৮

সম্পাদনা

সুকুমার বাগচি

সহযোগী সম্পাদক **সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়** ❑ সহকারী সম্পাদক **বাসব রায়**

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ॥ ৫

স্বাগত ভাষণ ॥ **শ্যামাশিস ভট্টাচার্য** ॥ ৭

স্মরণ-১ ॥ রমানাথ ভট্টাচার্য নিজগুণেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন ॥ **সুকুমার বাগচি** ॥ ৯

স্মরণ-২ ॥ নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয় ॥ **সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়** ॥ ১১

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ১৪

সিলেট নাগরী ॥ **পদ্মনাথ দেবশর্মা** ॥ ১৫

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস : **সংক্ষিপ্ত জীবনী** ॥ ২২

ভারত-ভ্রমণ (প্রথমার্ধ) ॥ **রামনাথ বিশ্বাস** ॥ ২৩

এ-যাবৎ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ ॥ ৪৮

স্মারকগ্রন্থ উন্মোচনকারী গুণীগণ ॥ ৪৯

এ-যাবৎ পুরস্কৃত কবিদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ॥ ৫০-৬৫

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি ॥ সংকলন : **রমানাথ ভট্টাচার্য** ॥ ৬৬

মতামত ॥ ৭২

সম্পাদকের নিবেদন

বর্তমান স্মারকগ্রন্থে বিশেষ সংযোজন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের 'সিলেট নাগরী' আর রামনাথ বিশ্বাসের 'ভারত ভ্রমণ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অখণ্ড ভারতের কয়েকটি অঞ্চল ভ্রমণের বৃত্তান্ত। সংগ্রহ করা সম্ভব হলে, প্রতিবছরই পদ্মনাথ ও রামনাথের রচনার সঙ্গে এ-যুগের পাঠকদের নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে।

'সিলেট নাগরী' শীর্ষক রচনাটির সন্ধান পাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্ব') এবং জানা যায় যে পদ্মনাথের প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় ১৩১৫ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। গুয়াহাটির কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শ্রী প্রসূন বর্মন এই দুষ্প্রাপ্য রচনাটির জিরক্স কপি সংগ্রহ করে দিয়েছেন, সেজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এ-বছর পুরস্কার প্রাপক দুজন কবি সহ এ-যাবৎ পুরস্কৃত মোট ষোলো জন কবিরই সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রয়েছে পূর্ববর্তী বছরগুলির স্মারক বক্তৃতাগুলির বিষয় আর বক্তাদের নামের তালিকা যুক্ত একটি আলাদা পৃষ্ঠা। সেইসঙ্গে দেওয়া হয়েছে স্মারকগ্রন্থ উন্মোচকদের নামের তালিকাও। এবারকার 'মতামত' বিভাগের জন্য একটিমাত্র চিঠি পাওয়া গিয়েছে। স্মারকগ্রন্থটির নিরন্তর উন্নয়নের প্রয়োজনে পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে আমরা সর্বদাই আগ্রহী। সে-কারণে আমাদের বিভিন্ন ত্রুটি নির্দেশ সহ ইতিবাচক প্রস্তাব পেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ রইল।

পদ্মনাথ ও রামনাথের রচনা দুটির আগে তাঁদের সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের প্রয়াত সভাপতি রমানাথ ভট্টাচার্য সংকলিত বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল এবং প্রতিবছরের স্মারকগ্রন্থই পৃথকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, কুলপঞ্জিটির পুনর্মুদ্রণ তাই অব্যাহত রাখা হলো।

পদ্মনাথের নিবন্ধ, রামনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং দুটি স্মারক বক্তৃতা সহ প্রতিটি রচনা সম্পাদনার সময় আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তবে উদ্ধৃতিগুলিতে মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে এ-বছরও ফাউন্ডেশনর সাধারণ সচিব শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি— এ-কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি। সম্পাদনাকার্যে নানাভাবে সাহায্যের জন্য সহযোগী সম্পাদক শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রী বাসব রায়কে ধন্যবাদ।

স্বাগত ভাষণ

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের অষ্টম বৎসরের অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এখানে উপস্থিত প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, কেননা আমি বিশ্বাস করি, এই উপস্থিতিই অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আপনাদের সীমাহীন ভালোবাসা প্রমাণ করে।

এই ফাউন্ডেশনটির সৃষ্টি হয়েছিল প্রধানত কবিতার প্রতি একজন ব্যক্তির গভীর অনুরাগের কারণে। তিনি আমার পিতা আর ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি রমানাথ ভট্টাচার্য। তাঁর প্রয়াণে অন্য অনেক কিছু ছাড়াও একজন কবিতা-প্রেমিককে আমরা হারিয়েছি বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি। নিজের রচিত কবিতার জন্য জীবিতকালে কতটা স্বীকৃতি পাবেন সে-ব্যাপারে আমার পিতা আদৌ ভাবিত ছিলেন না। বরং তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, তাঁর কবিতা যদি যথার্থ কবিতা হয়ে থাকে তাহলে কালের বিচারে হয়তো উত্তীর্ণ হবে, অন্যথায় বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে যাবে।

তবে একটা বিষয়ে তাঁকে কিছুটা চিন্তিত দেখেছি। বিশেষ করে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় দুটি ভাষা বাংলা ও অসমিয়ায় কবিতা পড়া ও লেখার ব্যাপারে যুবসমাজের উৎসাহের অভাব তাঁকে পীড়া দিত। আর ঠিক সেই কারণেই এই দুটি ভাষার কবিদের জীবনব্যাপী সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার প্রদানের প্রথা শুরু করার কথা তিনি ভাবেন আজ থেকে প্রায় নয় বছর আগে। আমি আশা রাখি, ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগের প্রতি গুয়াহাটির সাহিত্যসমাজের ধারাবাহিক সমর্থন এবং সময়ে-সময়ে সুপরামর্শ আমরা পাব।

পরামর্শের প্রসঙ্গে একটা আক্ষেপের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। গত সাত বছর ধরে এই অনুষ্ঠানে প্রতিবারই আমি উপস্থিত সুধীবর্গকে অনুরোধ করেছি, পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা হিসেবে কোন্ কোন্ বিষয় তাঁদের মনে আগ্রহের সঞ্চার করবে সে-ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানানোর জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-সম্পর্কে ইতিবাচক কোনো প্রতিক্রিয়া আমার গোচরে আসেনি। সে-কারণে গতবছর বাবার জীবিতকালেই স্মারক বক্তৃতা দুটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার পরিবর্তে এবার থেকে আমরা পুরস্কৃত কবি দুজন এবং দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বের ব্যবস্থা করেছি, যা আকর্ষক আর সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবি ও তাঁদের সৃষ্টিকে আরো ভালোভাবে বোঝবার সহায়ক হবে বলে আমি আশা রাখি।

এ-রাজ্যের দুটি প্রধান ভাষার কবিকে একই সঙ্গে এক মঞ্চে পুরস্কার প্রদানের একটা প্রধান উদ্দেশ্য উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সেতুবন্ধন। সুখের কথা, দুটি ভাষার স্থানীয় কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, শিক্ষাব্রতী, শিল্পী ও ভাষাপ্রেমীরা আমাদের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত থেকে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আমি নিশ্চিত, আগামীদিনেও তাঁদের সহযোগিতা আমাদের লক্ষ্য পূরণের সহায়ক হবে।

আরো একটা কথা। বাবার প্রয়াণের কয়েক মাস আগে তাঁর দুটি কবিতার বই মুদ্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছাপূরণের অঙ্গ হিসেবে আজকের অনুষ্ঠানে বই দুটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গুয়াহাটি
১৮ মার্চ ২০১৮

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

স্মরণ-১

রমানাথ ভট্টাচার্য নিজগুণেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন

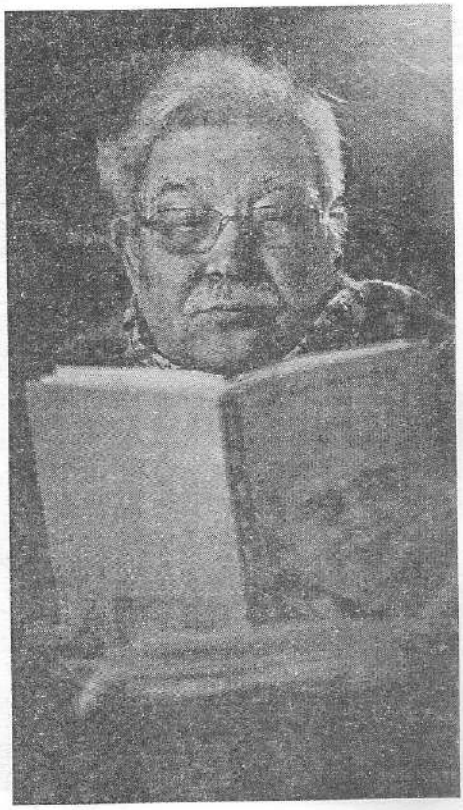

কী বলব? কীই-বা বলা যায়? এইসব বেদনাদায়ক মুহূর্তে মন খানিকটা অসাড় থাকে। যদিও ভাবনা থাকে সক্রিয়। কিন্তু তার সোচ্চার প্রকাশে অজস্র কুণ্ঠার জাল। স্মৃতি রোমন্থনও নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়। অথচ বয়স বাড়ার এই এক সমস্যা। বহু প্রিয়জনের বিদায়ের সাক্ষী থাকতে হয়, তাদের স্মরণ-অনুষ্ঠানে দু-এক কথা বলতে হয়, কখনো কখনো লিখতেও হয়।

রমানাথের শরীর বেশ কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছিল না। শ্বাসের কষ্ট ছাড়াও ছিল আরো কয়েকরকম রোগের যন্ত্রণা। তবু চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের সাহায্যে মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। তাঁর সৃষ্টিশীলতাও ছিল অক্ষুণ্ণ। এবার মুম্বাই থেকে গুয়াহাটি আসার আগে ৬ আগস্ট তাঁর বাসায় গিয়ে কিছু কথাবার্তা হয়। আলোচনা হয় তাঁর নামাঙ্কিত ফাউন্ডেশনের আগামী পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান, স্মারকগ্রন্থের রচনা নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে। স্বভাবত তিনি অন্তর্মুখী হলেও সেদিন মনে হয়েছিল, আগের চেয়ে খানিকটা যেন ম্লান, কিছুটা যেন বিমর্ষ। কিন্তু তখনও এটাই শেষ সাক্ষাৎকার হবে বলে বুঝে উঠতে পারিনি। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ তাঁর গুরুতর অসুস্থতার খবর পাই, তখন ভেন্টিলেশনে। তবে ক্রমশ অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত দেশের বাইরে থাকায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। গতকাল কলকাতায় ফিরে ফোন করি, ফোন বেজে যায়। তাঁর ছেলে শ্যামাশিসকেও ফোনে পাই না। সন্ধ্যায় এল সেই মর্মান্তিক সংবাদ।

রমানাথের পত্নী রিক্তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার জানা নেই। তাঁদের সুসন্তান শ্যামাশিস শুধু কর্তব্যই করেনি, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পিতার সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। তাকেও দীর্ঘকাল এই শোকভার বহন করতে হবে।

বেশি কিছু বলতে বা লিখতে ইচ্ছে করছে না। শুধু জানাই, রমানাথের সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার ইতিহাস অর্ধশতকের সীমা ছুঁতে চলেছে। তিনি যেমন ছিলেন কবিতা-অন্ত-প্রাণ, তেমনই লেখালিখি ও জীবনযাপনেও অত্যন্ত সুশৃঙ্খল, শেষোক্ত বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবু বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর সম্পাদিত 'ঋতুরঙ্গ' ও 'শিলঙের কবিতা' পত্রিকায় সেই সত্তরের দশকের প্রথমদিকে আমার কবিতা বেরিয়েছিল, আমার কাছে তার কোনো কপি ছিল না, ভুলেও গিয়েছিলাম। মাত্র চার-পাঁচ বছর আগে একদিন সেগুলো উদ্ধার করে তিনি আমাকে উপহার দেন।

আমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও নির্ভরতা এতটাই ছিল যে তাঁর নামাঙ্কিত ফাউন্ডেশনের সঙ্গে শুরু থেকেই তিনি আমাকে জড়িয়ে নেন। ভালোবাসা ছিল বলেই কখনো কোনো কারণে আমার ওপর তাঁর অভিমান হয়েছে, আমারও অভিমান হয়েছে তাঁর ওপর, কিন্তু বন্ধুত্ব অটুট ছিল, তাই সেসব বাষ্প হয়ে উড়েও গেছে। তাঁর সাম্প্রতিক কৃতি ও কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অনেকেই জানেন, আমার বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেহাবসানের পরে আত্মা ও তার অমরত্বের বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি, অসংখ্য মানুষের মনে রমানাথ নিজগুণেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবেন। ❑

- সুকুমার বাগচি

কলকাতা, ৪ অক্টোবর ২০১৭

(রচনাটি ২০১৭ সালের ৪ অক্টোবর গুয়াহাটিতে 'ব্যতিক্রম মাসডো' এবং কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-পূর্ব লিট্‌ল ম্যাগাজিন আর্কাইভ আয়োজিত রমানাথ ভট্টাচার্যের স্মরণসভায় পঠিত।)

স্মরণ-২

নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয়

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

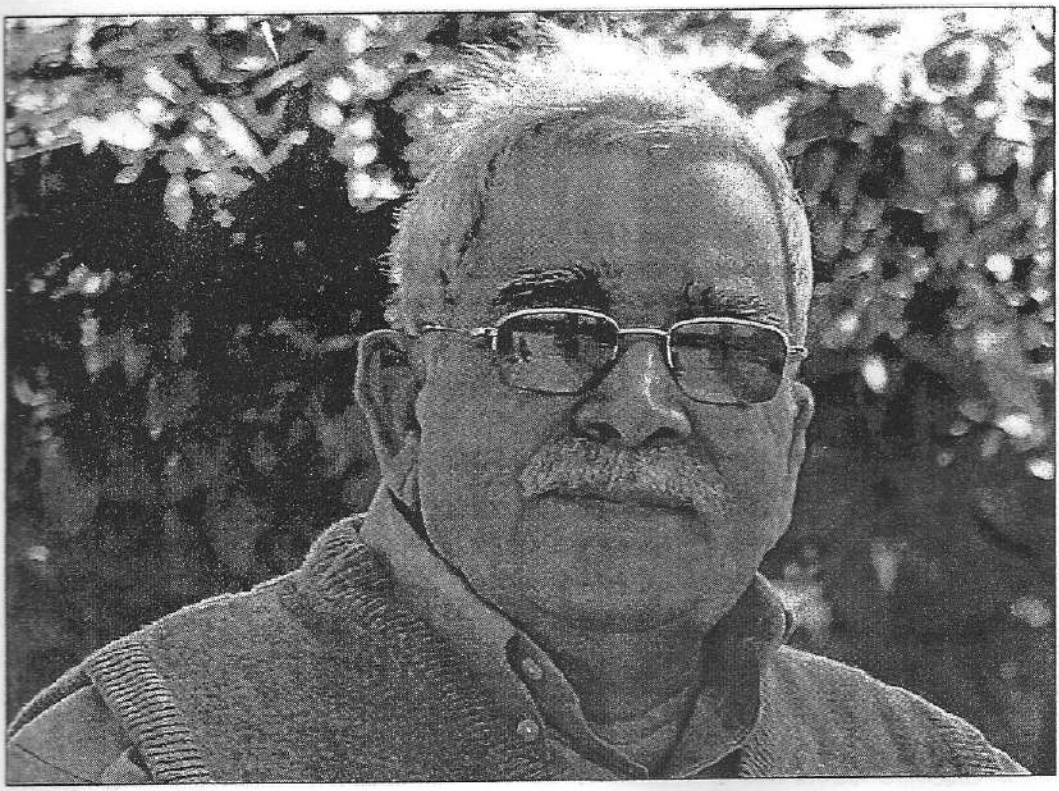

কবি শ্যামলকান্তি দাশের চলভাষে ভেসে আসে দুঃসংবাদ, কবি রমানাথ ভট্টাচার্য আর নেই। ৩ অক্টোবর ২০১৭ মঙ্গলবারের প্রদোষকাল, অংশুপতি অস্তগত। মনে পড়ে একরাশ কথা! কী অমায়িক ছিল তাঁর ব্যবহার, কী স্নেহসিক্ত ছিল তাঁর বাচন, কী স্নিগ্ধ ছিল তাঁর মন। মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিল। এখন —

মৃত্যুর ছায়ার নীচে স্মৃতি, ভালোবাসা
কস্তুরী-মদির উদ্ভাসিত স্তিমিত বিদ্যুৎ
আকাশ বাজায় ক্লান্তির বেহাগ
তুমি ছিলে একদিন, আজো আছো নাকি
বৃষ্টি জুঁই শ্যাওলা দিয়ে ঢেকে দিতে ক্ষত?
সব কথা শিলালিপি।

(মৃত্যুর ছায়ার নীচে : রাম বসু, দে'জ ২০০৫)

বেদনার্ত হয়ে পাষাণলিপির অর্থোদ্ধারে আনত হই। রমানাথ ভট্টাচার্যের জন্ম ১ ডিসেম্বর ১৯৪১। আদি নিবাস বানিয়াচং-

বিদ্যাভূষণ পাড়া-শ্রীহট্ট-ঢাকা দক্ষিণ-অধুনা বাংলাদেশ। বাবা রমণীমোহন ভারত সরকারের জরিপ বিভাগের কর্মচারী, মা কিরণপ্রভা সংসারের অক্লান্ত প্রহরী।

ছেলেবেলার দুর্মর স্মৃতির কথায় রমানাথ লিখেছেন, "বাল্যকালে আমাদের উঠোনে, পাড়ায়, সামনের পাড়ায়, পেছনের পাড়ায় জ্যোৎস্না রাতের উছলে-পড়া রূপ দেখে আনন্দবিহ্বল হয়ে যেত আমার মন। আমার দেখা সেই ছোট জগৎটাই মনে হত স্বর্গপুরী। ইচ্ছে হত না ঘরে ফিরি। বোধহয় তখন থেকেই শুরু হয়ে গছে ভেতরে ভেতরে কবিতা রচনা। এ বয়সেই বাড়ির দৈনন্দিন পুজোর জন্য সাতসকালে পাড়া চষে সাজি ভরে তুলতাম গুলঞ্চ, গোলাপ, গন্ধরাজ, শিউলি, বেলি আর কত বিচিত্র বাহারি ফুল। ফুলের মধুর গন্ধ, আর অপরূপ রূপ আমাকে করত পাগল। বোধহয় তখন থেকেই মনোলোকে কবিতা-দেবীর পদার্পণ শুরু।" ('আমার সাহিত্য জীবন', মগ্নশিল্প পত্রিকা, কবি রমানাথ ভট্টাচার্য সংখ্যা, সাম্মানিক সম্পাদক : পার্থ শর্মা, প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা ১০১)

রমানাথের বয়স পনেরো, নবম শ্রেণির ছাত্র। নিলাম বাজারে বিপিনচন্দ্র হাই স্কুলে তাঁর ইংরেজির শিক্ষক ব্যোমকেশ পুরকায়স্থ কবিতার গুণমুগ্ধ শ্রোতা। রমানাথের হাতে লেখা খাতার 'প্রাণাঞ্জলি'র কবিতাগুচ্ছ তাঁর কবিত্বের প্রথম অভিজ্ঞান। রমানাথের দুর্ভাগ্য তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রাণাঞ্জলির খাতাটি কোথায় হারিয়ে গেল। শুধু কবিতার স্মৃতি নিয়ে তখন বেঁচে থাকা। কলেজে পড়ার আগেও অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তাও অনুজ রণজয়ের অজ্ঞতায় বাক্সবন্দি কবিতাগুলি ওজন দরে বিকিয়ে গেল। কলেজে পড়ার সময় রমানাথের একটি কবিতা কলেজ ম্যাগাজিনে এবং আর-একটি কবিতা শিলচরের 'প্রান্তজ্যোতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই দুটি কবিতা রমানাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা। কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটির নাম জানা যায়নি। প্রান্তজ্যোতি পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটির নাম ছিল 'ভারত কেশরী নেতাজি সুভাষ'। তখন পর্যন্ত তাঁর কোনো কবিতা পাঠকের তেমন করে নজর কাড়েনি। চাকরিজীবনে প্রবেশের বেশ কয়েক বছর পরে রমানাথ গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পেয়েছিলেন।

কর্মজীবনে শিলংস্থিত এজি অফিসে যোগদান করার আগে আড়াই বছর কাল তিনি কালীগঞ্জ পাবলিক হাই স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক পদে বৃত ছিলেন। এরপর কবি রমানাথ ভট্টাচার্যের কবিতা পত্রিকা প্রকাশের ইতিহাস।

১৯৬৯-এর ১৭ নভেম্বর রমানাথ ও তাঁর সহকর্মী শ্রীকান্ত ভট্টাচার্যের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো শিলঙের প্রথম মুদ্রিত কবিতা-পত্রিকা 'শিলঙের কবিতা'। পত্রিকাটি বের হবার পরে শ্রীকান্ত বদলি হয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। এরপর পীযূষ ধর ও রমানাথ ভট্টাচার্যের যৌথ সম্পাদনায় পরপর দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংকলন (২৫ নভেম্বর ১৯৭০) অর্থাৎ চতুর্থ বা সর্বশেষ সংকলন রমানাথের একক সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৭০-এর আগস্ট মাসে রমানাথের সম্পাদনায় শিলং থেকে বের হলো নতুন কবিতার কাগজ 'ঋতুরঙ্গ'। এই কাগজটিও মাত্র কয়েক বছর বেঁচেছিল। আশ্চর্য, কবি রমানাথ গবেষণার সুযোগ পেলেও তাঁর প্রাণের জিনিস কবিতাকে ছাড়তে পারেননি। কাজেই গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের (১৯০৫-১৯৯০) কাছে তাঁর আর গবেষণা করা হয়ে ওঠেনি।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে রমানাথ একদিন অসমে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখানে তাঁর উদ্‌বর্তনের ইতিহাস সহজ ছিল না। কিন্তু বিলম্বে হলেও এখানে পেলেন বন্ধুবর্গ, কবিতার স্বভূমি এবং রুটিরুজির কর্মক্ষেত্র, আত্তীকরণের আর-একটি নতুন ভাষা অসমিয়া। ঋদ্ধি আর সিদ্ধির সেতুবন্ধন। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, "নীলমণি ফুকনের স্নেহ ভালোবাসা আমার জীবনে ঐশী দান।" তিনি আরো লিখেছেন, "কবি নবকান্ত বরুয়া ও নীলমণি ফুকনের সঙ্গে আমার শ্রদ্ধামধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।" এই সম্পর্কের গভীরতার উল্লেখ আছে রমানাথের 'লুইতের পদাবলী' কাব্যগ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪০১) উৎসর্গপত্রে —

নবকান্ত বরুয়া
নীলমণি ফুকন
শ্রদ্ধাস্পদেষু
যাঁদের সান্নিধ্যে এসে অসমিয়া কবিতার ভুবনে
আমার প্রথম ভ্রমণ

কবিতা রমানাথ ভট্টাচার্য 'নির্বাচিত কবিতা'র (জানুআরি ২০০৭) 'প্রাক্-কথন' অংশে অনায়াসেই লিখতে পারেন "আমি আসামের কবি, নিখিলবঙ্গ কবিতাপ্রেমীর কাছে এই আমার সবিনয়

নিবেদন।" কবিতায়ও ওই একই উচ্চারণ —

আসাম দেশের লোক
আসামের ধূলি আসামের মাটি অরূপ রতন রোজ
আসাম-আকাশ তার পথঘাট আলোক জ্বালায় রোজ
সুনীল সোনালি দিগন্ত দেখে আমি অবনত রোজ।

কবির 'হৃদয়ের একপাশে রূপরানি বঙ্গভূমি অন্যপাশে অলকা আসাম', তিনি শেষ জীবনে মুম্বাই নগরে নির্বাসিত হয়েও 'আসাম-বাংলার মুখ' মনে করে মুগ্ধ। তারই চিত্রবাণী চোখ মেলে দেখি, কান পেতে শুনি —

বঙ্গভাষী কবি আমি পরবাসী মুম্বাই নগরে,
এখানেই ঝরব আমি শেষদিন আসবে এইখানে;
তবে কিনা বঙ্গাসাম, নভোনীল জলমাটি তার
আলোকের মতো জ্বলে মুহুর্মুহু আমার হৃদয়ে;
ভুলিতে পারি না আমি বাংলার আসামের মুখ,
আমার হৃদয়পুরে দেশ দুটি রোজ বাজ্ময়
মন জুড়ে রূপরানি বঙ্গভূমি অলকা আসাম
দুটি দেশ মুহুর্মুহু জ্বলজ্বল হৃদয়-ভবনে,

('অন্য স্বর অন্য সুর' কাব্যগ্রন্থ, পাঠক, পৃষ্ঠা ১৮৪)

কবি রমানাথ উদারচিত্তে অনেক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে অর্থ দান করতেন। শুধু কবিতাকে ভালোবেসে এমন মন-প্রাণ-বুদ্ধি-হৃদয় ঢেলে দিতে আর কোনো বাঙালি কবিকে দেখিনি। আসলে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, রামনাথ বিশ্বাস ও স্বামী চণ্ডিকানন্দের আত্মজ অন্বেষণ ও বরাভয় তিনি পেয়েছিলেন। তাই তাঁর মাত্রাহীন মন্ত্র ভাষা পায় —

পদ্মনাথ রামনাথ
রক্তের ভিতরে
সমুদ্রের কাছে তাই
নতজানু রোজ
ভক্তদের কাছে স্থির
পাহাড় সদৃশ।

('নির্বাচিত কবিতা', প্যাপিরাস, ২০০৭, পৃ. ২০২)

তাঁর গ্রন্থের শব্দ দূষণকে তিনি ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ মনে করতেন। এমন ঘটনাও ঘটেছে তাঁর মুদ্রিতগ্রন্থ বানান দূষণের জন্য তিনি বাতিল করে আবার পরিমার্জনায় নতুনভাবে ছাপিয়েছেন। অনেকেই এই বিষয়টিতে তাঁর পাগলামির ছাপ স্পষ্ট দেখতে পারেন। কিন্তু এইরকম পাগল যদি বাঙালি সমাজে থাকত, তাহলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি অন্যমাত্রা পেত। শিব ও চৈতন্য তো পাগল ছিলেন!

তাঁর নির্মাণ ও সৃষ্টিতে আছে 'অলিন্দে সূর্যের হাওয়া' (তিনজন কবির সঙ্গে একত্রে, ১৯৭৬), 'লৌকিক বৃত্তের ভিতর' (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৭৮), 'এবং পৃথিবী' (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৮২), 'লুইতের পদাবলী' (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৯৪), নির্বাচিত সনেট' (কাব্যগ্রন্থ, ২০০০), 'পড়োশি গোলাপ' (নীলমণি ফুকনের কবিতার অনুবাদ, ২০০৭), 'নির্বাচিত কবিতা' (২০০৭), 'এবং অনন্ত ভালো' (কাব্যগ্রন্থ, ২০১০), 'অন্য স্বর অন্য সুর (কাব্যগ্রন্থ, ২০১৪), 'কালো ফুল রাঙা ফুল' (কাব্যগ্রন্থ, ২০১৭) এবং 'কবির গদ্য' (বিভিন্ন সময়ে লেখা গদ্যের সংকলন, ২০১৭)। এ-ছাড়া তাঁর 'আধুনিক অসমীয়া কবিতা' (অনুবাদ-টীকা-ভূমিকা, ১৯৯২) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৯৩-এর ৮ এপ্রিল গুয়াহাটিস্থিত লক্ষ্মীরাম বরুয়া সদনে সাহিত্যকানন আয়োজিত মহতী সভায় এই গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেছিলেন অসমের তদানীন্তন সম্মাননীয় রাজ্যপাল লোকনাথ মিশ্র।

অধ্যাপক পার্থ শর্মা রমানাথ ভট্টাচার্যকে নিয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি 'মগ্নশিল্প' পত্রিকার সাম্মানিক সম্পাদক হিসেবে দশম বর্ষ ২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে 'কবি রমানাথ ভট্টাচার্য সংখ্যা' করেছেন। তাঁর অন্য কাজটি হলো 'কবি রমানাথ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ (প্রকাশক : রূপসী বাংলা, প্রথম প্রকাশ ২০১২) প্রকাশ। দ্বিতীয় গ্রন্থটি পার্থ শর্মার গবেষণাধর্মী কাজ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রমানাথের জীবন ও সাহিত্য সাধনার আকরগ্রন্থ হিসেবে তা বিবেচিত হবেই হবে।

রমানাথ ভট্টাচার্য কলকাতার পোয়েট্‌স ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার (২০০৮) পেয়েছেন। ইসক্রা-পত্রিকার পক্ষ থেকে ২০০৯ সালে তাঁকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালে গুয়াহাটি থেকে 'ব্যতিক্রম' সাহিত্য পুরস্কারও পেয়েছেন।

কিন্তু নক্ষত্রেরও আয়ু শেষ হয়। এখন স্মৃতি শুধু 'বোধের গভীরে শান্ত আবির্ভাব নিশীথিনীসম।' (মৃত্যুর ছায়ার নীচে : রাম বসু) ❑

[সৌজন্য : শ্যামলকান্তি দাশ সম্পাদিত 'নতুন কবিসম্মেলন']

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

(১৮৬৮-১৯৩৮)

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্ম অবিভক্ত অসমের শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙে, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)। বানিয়াচং রাজবংশের সন্তান পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসম রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি.এ. পাশের পর সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত পাঠক্রম সমাপ্ত করে ঢাকা সারস্বত সমাজ কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমের উজ্জ্বল রত্ন পদ্মনাথের কর্মজীবন শুরু হয় শিলঙে, ১৮৯৩ সালের ১০ নভেম্বর, রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারী হিসাবে, সেখানে তিনি সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুরমা উপত্যকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল্স-এর কার্যভার গ্রহণের জন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১ জানুআরি শিলং ত্যাগ করেন। সিলেটে বাসকালে তিনি নিজ উদ্যোগে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে তুলে দেন অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে, যিনি ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন পদ্মনাথের আর্থিক সহায়তায়।

যদিও পদ্মনাথ সিলেটের বিখ্যাত মুরারিচাঁদ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন, ১৯০৫ সালের জুন মাসে ইতিহাস ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসাবে গুয়াহাটির কটন কলেজে যোগদানের পরে তিনি বিশেষভাবে ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কটন কলেজে থাকাকালীন তিনি এক ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি', 'কামরূপশাসনাবলী' এবং 'মি. গেইট্'স হিস্টরি অব আসাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ৭ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' (আসাম রিসার্চ সোসাইটি)। অসমের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে 'কামরূপশাসনাবলী' নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ এবং এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন এবং 'অসম সাহিত্য সভা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পদ্মনাথকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করে, তবে 'অশাস্ত্রীয়' সারদা আইনের প্রতিবাদে এই খেতাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

শেষজীবনে পদ্মনাথ কাশীবাসী হন এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে 'সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত তাঁর দুটি বই ('আলোচনা চতুষ্টয়' ও 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') প্রকাশ পায়। ❑

সিলেট নাগরী

পদ্মনাথ দেবশর্মা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মোসলমানি কেতাবগুলির কোনো বিবরণী দেখা যায় না। অথচ সংখ্যায় ও কাটতিতে ওই সকল কেতাব যে নেহাত কম সে-কথা বলা যায় না। মোসলমানি বাংলা বঙ্গভাষার উর্দু, তবে উর্দু হিন্দি হইতে ভিন্ন অক্ষরে লিখিত, কিন্তু মোসলমানি বাংলা বঙ্গাক্ষরেই লিখিত। বুঝি এই বিশেষত্বটুকু বজায় থাকিতেছে না, সত্বরই বোধহয় সমগ্র মোসলমানি কেতাব ভিন্ন অক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাইব।

পূর্ববঙ্গ মোসলমান-প্রধান স্থান, তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রায় পূর্বতম অংশ শ্রীহট্ট-অঞ্চলে মোসলমানের সবিশেষ প্রাধান্য। সুতরাং মোসলমানি বাংলারও শ্রীহট্ট একটি প্রধান আড্ডা।

খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতকে শাহজলাল নামক এক অতিশক্তিশালী মহাপুরুষ আরবদেশের এমেন-প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে দিগ্‌বিজয়ীর বেশে সৈন্যসামন্ত সহ শ্রীহট্টের তদানীন্তন হিন্দু ভূপতি গৌরগোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল। একপ্রকার বিনা রক্তপাতেই শ্রীহট্ট মোসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। শাহজলালের সঙ্গে ৩৬০ জন মোসলমান আউলিয়া আইসেন, উঁহারা এবং সৈন্যসামন্তেরও অনেকে শ্রীহট্টের নানা স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

ইঁহাদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তখনও বোধহয় আরব্য অক্ষরে হিন্দি ভাষা লিখিত হইয়া উর্দুর সৃষ্টি হয় নাই। তাই এই সকল মোসলমান প্রধানত হিন্দি-ভাষারই চর্চা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে লেখাপড়া করিতেন। তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীহট্টের সাধারণ মোসলমানের মধ্যেও নাগরাক্ষর লব্ধ-প্রসর হইল। কালক্রমে যদিও পশ্চিমাঞ্চলে মোসলমান-সমাজে হিন্দি আরব্য অক্ষরে লিখিত হইয়া আরব্য-পারস্য-শব্দবহুল হইয়া উর্দুতে পরিণত হইল, এবং সেই উর্দু ক্রমশ সমগ্র মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রসৃত হইয়া শ্রীহট্টেও পৌঁছিল, তথাপি এই অঞ্চলের মোসলমানেরা নাগরাক্ষর একবারে পরিত্যাগ করিল না। তবে এই নাগরাক্ষরের প্রসার অনেকটা খর্ব হইল। একদিকে স্থানীয় বঙ্গভাষা অন্যদিকে মোসলমানের আলোচ্য আরব্য, পারস্য ও উর্দু এই উভয় সংকটে পড়িয়া নাগরাক্ষর হীনপ্রভ এবং শীর্ণ ও বিকৃত হইতে লাগিল। খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ইহার অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল যে নিম্নস্তরের মোসলমানদের মধ্যে যাহারা বঙ্গাক্ষর জানিত না তাহারা পরস্পরের মধ্যে চিঠিপত্রে মাত্র এই অক্ষরের ব্যবহার করিত। ইহাদের হাতে পড়িয়া দেবনাগরের যে দুর্গতি ঘটিয়াছে তাহা অচিরেই দৃষ্ট হইবে।

আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, মুনশি আব্দুল করিম (ইনি আরব, মিশর ও ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশে আসিয়া নিজ সমাজের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, দৈবাৎ নদীগর্ভে জাহাজ হইতে নিপতিত হইয়া অকালে এই কর্মঠ জীবনের অবসান হইয়াছে।) নামক জনৈক শ্রীহট্টবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি কর্তৃক এই বিকৃত নাগরাক্ষর "সিলেট নাগরী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রারূঢ় হইয়াছে। ইতিপূর্বেই আরব্য-পারস্য পুস্তকের ন্যায়, এই অক্ষরে দুই-একখানি পুথি নাকি লিথোপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হওয়ার পর হইতেই যে এই অক্ষরের পুথির বহুল প্রচল হইতেছে, সেই বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্বে এই অক্ষর শ্রীহট্ট শহরের আশেপাশে মাত্র প্রচলিত ছিল। ছাপার

পর এইক্ষণে শ্রীহট্ট জেলার সমগ্র, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকা অর্থাৎ পদ্মার পূর্বদিকে বঙ্গভূমির সর্বত্র এই অক্ষর মোসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সিলেট নাগরীতে ৩২টি মাত্র অক্ষর, পাঁচটি স্বর এবং ২৭টি ব্যঞ্জন। অনুস্বার এবং ৫টি মাত্র স্বর-চিহ্ন আছে। আ-কার, একটি ঈ-কার (ী), একটি উ-কার (ু), এ-কার ও ঐ-কার।

অক্ষরগুলির আকৃতি স্বতন্ত্র প্রদর্শিত হইল। (ক চিত্র দ্রষ্টব্য)

অক্ষরগুলির প্রতি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে আ, ও, খ, ছ, ঝ, ল এবং হ এইগুলির আকৃতি নাগরাক্ষর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। স্বর-চিহ্নগুলি ঠিক দেবনাগরের মতোই। সমস্ত অনুনাসিক বর্ণমধ্যে ন এবং স-ই আছে। ন ও স-এ এক-একটি এবং অন্তঃস্থ 'ব'টি লোপ পাইয়াছে। অথচ এক কাটছাঁটের মধ্যে অতিরিক্ত 'ড়' একটি নিতান্ত আবশ্যক ভাবে রাখা হইয়াছে, ইহার কাজ 'ড' কিংবা 'র' দ্বারা অনায়াসে চলিতে পারিত। স্বরবর্ণেই সংক্ষেপটা কিছু বেশি। অ, ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ এই অত্যাবশ্যক স্বরগুলি বর্জিত হইয়াছে।

সংযুক্ত বর্ণের তালিকা স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল। ('খ' চিহ্নিত চিত্র দ্রষ্টব্য)

মাত্র ১৬টি সংযুক্ত বর্ণ রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি বঙ্গ বা সংস্কৃত ভাষায় কোথাও পাওয়া যাইবে না, ইহা আলেফ্-লাম্ আল, কেবল 'আল্লা' শব্দটি লিখিতেই ইহার প্রয়োজন দেখা যায়। বাকি ১৫টি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণত আরবি বা পারসি শব্দে সচরাচর যে-সকল সংযুক্তবর্ণের প্রয়োগ আছে, তাহাই মাত্র রাখা হইয়াছে। এই স্থলেই সিলেট নাগরীর সংস্কারকের (প্রাগুক্ত মুনশি আব্দুল করিম যখন এই অক্ষরগুলির টাইপ করেন, তখন তিনি বর্ণমালার এবং সংযুক্তবর্ণের অনেকটা সংস্কার সাধন করেন। ফলত তাঁহার হস্তক্ষেপের পূর্বে এই নাগরীর যে কী অবস্থা ছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।) কৃতিত্ব কৌশলের সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলায় সংযুক্তবর্ণের সংখ্যা প্রায় দ্বিশত হইবে। এইগুলি শিক্ষা করাই বঙ্গভাষাধ্যায়ীর পক্ষে বড় সুকঠিন কাজ। ইহার সংখ্যা মাত্র ১৫তে পরিণত হওয়ায় এই নাগরী সাধারণ মোসলমানের পক্ষে সুগম হইয়াছে, তাই ইহার আদর দিন দিন বাড়িতেছে। 'ঞ্জ'তে 'ঞ'-এর কাজ 'ন' দ্বারা করা হইয়াছে এবং 'স্চ' স্থলে 'শ'-এর কাজ 'স' দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে।

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণমালা এবং মুষ্টিমেয় যুক্তাক্ষর লইয়া কাজ কীরূপে সম্পন্ন হয় তাহা প্রদর্শন নিমিত্তে নিম্নে দুইটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমটি দৈ-খোয়া উপনামক জনৈক মোসলমান সাধুর (ইঁহার প্রকৃত নাম জানা যায় না। ইনি দধিভক্ষণে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া "দৈ-খোরা" নামে শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই সাধু রামপ্রসাদের ন্যায় সাধনভজনের সঙ্গে সংগীতেরও চর্চা করিতেন। ইঁহার স্বর অতিশয় মধুর ছিল। জনসাধারণ কি মুসলমান কি হিন্দু -- ইঁহার সুমধুর স্বরে এবং সংগীতের সরল ভাষা ও নিগূঢ় ভাবে আকৃষ্ট হইয়া তদ্রচিত অনেক গান কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। বহুদিন হইল ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, কিন্তু আজিও শ্রীহট্টের পূর্বোত্তরাঞ্চলে সাধারণ লোকেরা আগ্রহ সহকারে ইঁহার গান করিয়া থাকে। এই মহাত্মার জন্মস্থান নোয়াখালি ছিল বলিয়া প্রবাদ, কিন্তু সংসার ছাড়িয়া তিনি জীবনের শেষাংশ শ্রীহট্ট শহর ও তন্নিকটস্থ স্থানেই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। কেননা শ্রীহট্ট ভূমি শাহজলাল কর্তৃক পরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিঘোষিত হওয়ায় মোসলমানের নিকট এক পুণ্যধাম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।) গীত। দ্বিতীয়টি 'সিলেট নাগরির পহেলা কেতাব' প্রকাশকের বিজ্ঞাপন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হইতে সূচিত হইবে, মোসলমান সাধারণের এই নাগরীর পুথি পড়িবার জন্য এবং প্রকাশকদেরই-বা ইহার প্রচারকল্পে কত আগ্রহ।

দৈ-খোরার গীত।

(গ চিহ্নিত চিত্র দ্রষ্টব্য -- এক-একটি লাইনের নিম্নে ১ক, ১খ, ২ক, ২খ এইরূপ দুই-দুইটি লাইন চিহ্নিত করা হইল। ১ক-তে মূলের বঙ্গাক্ষরে যথাযথ প্রতিলিপি, ১খ-তে সাধারণ বাংলায় পরিবর্তন।)

১।

১ক। আমার হেলাএ হেলাএ গেল জাতি রে পাড়ার লুক।

১খ। আমার হেলায় হেলায় গেল জাতি রে পাড়ার লোক।।

২।

২ক। ও আমার হেলাএ হেলাএ গেল জাতি। ধুআ।।

২খ। ও আমার হেলায় হেলায় গেল জাতি। ধুয়া।।

৩।

৩ক। সীসু-কালে হইল বিআ না ভজিলাম পরাণ দীআ।

৩খ। শিশু কালে হইল বিয়া না ভজিলাম প্রাণ দিয়া।

৪।

৪ক। জুবত কালে হইল ওইনয় সাথা।
৪খ। যুবতী কালে হইল (হইনু) অন্যের সাথী।
৫।
৫ক। জউবন গাইয়া গেল সংগী সব পলাইল।
৫খ। যৌবন গৈয়া গেল সঙ্গী সব পলাইল।
৬।
৬ক। ওবে বল কি হালে বসতী * রে।
৬খ। হবে (?) বল কি হালে বসতি।। রে।
৭।
৭ক। সসুর হইলা কঠুর — ভাসুর হইলা নীসঠুর।
৭খ। শ্বশুর হইলা কঠোর ভাসুর হইলা নিষ্ঠুর।
৮।
৮ক। দেওর হইলা বাউর মতি।
৮খ। দেবর হইলা বায়ুর (পাগলের) মতি।
৯।
৯ক। ভবের জন্‌জালে ওতী সাসুড়ীএ গুরজে নীতী।
৯খ। ভবের জঞ্জালে অতি শাশুড়ীয়ে গর্জে নিতি।
১০।
১০ক। কাল ননদীএ করেন দুরগতী * রে।
১০খ। কাল ননদীয়ে করেন দুর্গতি ।। রে।
১১।
১১ক। ইসট ভিতর জনভাই বন্দু গণ।
১১খ। ইষ্ট ভিতর জন ভাই বন্ধু গণ।
১২।
১২ক। এই সব সমপদর সাতী।
১২খ। এই সব সম্পদের সাথী।
১৩।
১৩ক। ধন মান হারইনু দুখে আসী পরবেসীনু।
১৩খ। ধন মান হারাইনু দুঃখে আসি প্রবেশিনু।
১৪।
১৪ক। সংকট কালে কুথাএ রইলাএ গীআতী *
১৪খ। সঙ্কট কালে কোথায় রইলা জ্ঞাতি।।
১৫।
১৫ক। দই খুয়া পাগলে বলে জনম গেল মর বীফলে।
১৫খ। দৈ-খোরা পাগলে বলে জন্ম গেল মোর বিফলে।
১৬।
১৬ক। বীচারেতে না হইলাম সতী।
১৬খ। বিচারেতে না হইলাম সতী।
১৭।
১৭ক। খেমাইর ঘরে দীআ বাতী চিন্তা কর সংগের সাতী।
১৭খ। ক্ষমার* ঘরে দিয়া বাতি চিন্তা কর সঙ্গের সাথী।
(* খেমাই অর্থাৎ ক্ষমা — নিবৃত্তি বৈরাগ্য)
১৮।
১৮ক। একমনে না ভজিলাম পতী * রে।
১৮খ। একমনে না ভজিলাম পতি ।। রে।

প্রকাশকের বিজ্ঞাপন।

১।
১ক। সুনহ মুমীন ভাই আরজ আমার।
১খ। শুনহ মোমিন (বিশ্বাসী) ভাই আরজ (নিবেদন) আমার।
২।
২ক। নাগরী ইলেম তয় লুক বেসুমার *
২খ। নাগরী ইলিম (বিদ্যা) তয়ে (জন্য) লোক বেশুমার (অসংখ্য)
৩।
৩ক। খাহেস রাখেন দীলে শীখিতে তাহাএ।
৩খ। খাহেশ (ইচ্ছা) রাখেন দেলে (চিত্তে) শিখিতে তাহায়।
৪।
৪ক। পহেলা কেতাব তার খুজী নাহি পাএ *
৪খ। (প্রথম) কেতাব (পুথি) তার খুঁজি নাহি পায়।।
৫।
৫ক। ছহল ইলীম এয়া ছীলেট নাগরী।।
৫খ। সহল (সোজা) ইলিম ইহা সিলেট নাগরী।
৬।
৬ক। সীখে সব লুকে বড় মেহেনত করী *
৬খ। শিখে সব লোকে বড় মেহনৎ (শ্রম) করি।।
৭।
৭ক। দেখীআ এমত অমী ভাবীনু দেলেতে।।
৭খ। দেখিয়া এমত আমি ভাবিনু দেলেতে।
৮।
৮ক। পহেলা কেতাব হলে আছান হবে তাতে *
৮খ। পহেলা কেতাব হ'লে আসান (সহজ) হবে তা'তে।।
৯।

৯ক। মুমীনের দীলে জবে দেখীনু খাহেস্।
৯খ। মোমিনের দিলে যবে দেখিনু খাহেশ্।
১০।
১০ক। তাদের আছানী তর করীআ কুসাস *
১০খ। তাদের আসানি তর করিয়া কুশিশ্ (চেষ্টা)।।
১১।
১১ক। লেখীনু হরফ সব করী জুদা জুদা।।
১১খ। লিখিনু হরফ্ (অক্ষর) সব করি জুদা (পৃথক) জুদা
১২।
১২ক। এক দীনে সীখী নীবে জদী করে খুদা *
১২খ। একদিনে শিখি নিবে যদি করে খোদা (ঈশ্বর)।।
১৩।
১৩ক। বাংগালা হরফ দীনু নীচেতে তাহার।।
১৩খ। বাঙ্গালা হরফ্ দিনু নীচেতে তাহার।
১৪।
১৪ক। বাংগালা জানন জারা খাতের তারার *
১৪খ। বাঙ্গালা জানেন যাঁরা খাতের (অনুরোধ) তাঁদের।।
১৫।
১৫ক। বাংগালা হরফ দেখে আপে লীবে সীখে।।
১৫খ। বাঙ্গালা হরফ্ দে'খে আপে (নিজে) ল'বে শিখে।
১৬।
১৬ক। উছতাদ ধরীতে কীবা কাজ আছে তাকে *
১৬খ। ওস্তাদ (শিক্ষক) ধরিতে কিবা কাজ আছে তাঁ'কে।।
১৭।
১৭ক। হরফের বএআন পর লেখী দীনু গীত।।
১৭খ। হরফের বয়ান (বর্ণনা) পর লিখি দিনু গীত।
১৮।
১৮ক। দইখুরার রাগ পড়ী খুশী হইব চীত *
১৮খ। দৈখোয়ার রাগ (গীত) পড়ি খুশি (আনন্দিত) হবে চিত্ত।।
১৯।
১৯ক। তারপর আরজ করী করীনু তামাম।
১৯খ। তারপর আরজ করি করিনু তামাম (শেষ)।
২০।
২০ক। ছীলটী নাগরী পুথি পহেলা কেতাপ নাম *
২০খ। সিলেটি নাগরী পুথি পহেলা কেতাব নাম।।
২১।
২১ক। বহুত মেহেনতে এহা কুসীস করিআ।
২১খ। বহু মেহনতে ইহা কুশিশ করিয়া।
২২।
২২ক। নীজ খরচেতে ছাপী খুদাকে ভাবীআ *
২২খ। নিজ খরচেতে ছাপি খোদাকে ভাবিয়া।।
২৩।
২৩ক। পড়ীআ মুমীন সবে কদর করিলে।।
২৩খ। পড়িয়া মোমিন সবে কদর (আদর) করিলে।
২৪।
২৪ক। মেহেনত সফল হবে খুসী হব দেলে *
২৪খ। মেহ্নৎ সফল হবে খুশি হব দেলে।।
২৫।
২৫ক। আসা করি মুমীনানে মেহের করীআ।।
২৫খ। আশা করি মোমিনগণে মেহের (অনুগ্রহ) করিয়া।
২৬।
২৬ক। নেক দুআ দীবা মেরা আখের লাগীআ
২৬খ। নেক (শুভ) দুয়া (আশীর্বাদ) দিবেন মেরা (আমার) আখের (পরকাল) লাগিয়া।।
২৭।
২৭ক। মহ্ম্মদ আবদুল লতীফ ওধমের নাম।।
২৭খ। মোহম্মদ আব্দুল লোতিফ্ অধমের নাম।
২৮।
২৮ক। ছীলট সহর বীচে রাখীনু মুকাম *
২৮খ। সিলেট সহর (নগর) বিচে (মধ্যে) রাখীনু মোকাম (আবাস)।।
২৯।
২৯ক। হাত জুড়ে কহী এবে জুনাবে সবার।
২৯খ। হাত জুড়ি কহি এবে জোনাবে (সাক্ষাৎ) সবার।
৩০।
৩০ক। মুমীনের খেদমতে ছেলাম হাজার *
৩০খ। মোমিনের খেদমতে (সকাসে) সালাম (অভিবাদন) হাজার।

প্রবন্ধদ্বয় হইতে প্রতীত হইবে যে স্বরের প্রধান অ-কারের কার্য 'ও' দ্বারা সাধিত হইতেছে। ও-কারের স্বরচিহ্ন (ো) না-থাকিলেও উাহার কার্য উ-কার দ্বারা (যথা লোকের পরিবর্তে

লুক) নিষ্পন্ন হয়। ঐ-কার থাকিলেও সচরাচর ইহার স্থানে 'অই' এবং ঔ-কারের স্থানে 'অউ' ব্যবহৃত হয়। ফলকথা আরব্য পারস্যে যদি জের-জবর-পেশ এই তিনটি মাত্র স্বরচিহ্ন দ্বারা কাজ চলিতে পারে, যদি ওই তিনটিরই মাত্র সহায়তায় হিন্দিকে উর্দুতে পরিণত করা যাইতে পারে, তবে এইস্থলেও ক.জ না-চলিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধেও ওই কথা। আরব্য বর্ণমালাকে মূলাধার করিয়া দুই-চারিটি মাত্র অতিরিক্ত (যথা পারস্য -- চ, গ, প এবং উর্দু ট, ড) বর্ণ নাক্তা জুড়িয়া তৈয়ার করিয়া যদি তৎসাহায্যে হিন্দিভাষাটা লিখিতে পারা যায়, তবে এই স্বল্প-ব্যঞ্জনের সহায়তায় বাংলাভাষা লিখিতে বিশেষ অসুবিধা হইবার কোনো কারণ নাই। বিশেষত ইহাতে মাত্র মোসলমানি বাংলা লিখিবারই প্রয়াস হইতেছে। এই বাংলায় সচরাচর আরব্য-পারস্য শব্দেরই বহুল ব্যবহার দেখা যায়, সংস্কৃত শব্দ অতি কমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত শব্দের বিরলতায় দুটি বিষয়ে সুবিধা হইতেছে -- এক বর্ণাশুদ্ধি হইলেও তেমন বাধে না, অপর সংযুক্তবর্ণের অল্পতায়ও কোনোরূপ অসুবিধা হয় না।

একটা অভাব কিন্তু বড়ই অনুভূত হয়। যদি হসন্ত চিহ্নটি পরিগৃহীত হইত, তাহা হইলে "সমপদ" যে "সম্পদ" তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইত। এই নাগরীতে পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ইতিপূর্বে কেবল শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্যের চিৎপুর রোডস্থিত জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসেই হইত। সম্প্রতি আরো দুইটি প্রেস স্থাপিত হইয়াছে। এক হামিদী প্রেস শিয়ালদহ (কলিকাতা), অপর ইস্‌লামীয়া প্রেস শ্রীহট্ট। ইতিপূর্বে দুই-চারিখানি মাত্র মোসলমানি কেতাব এই অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। সম্প্রতি বহু পুস্তক এই হরফে মুদ্রিত হইয়াছে এবং প্রকাশকদের সংকল্প এই যে যত মোসলমানি পুথি বঙ্গাক্ষরে আছে, তাহা এই অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করিতে হইবে, নূতন পুস্তকের তো কথাই নাই।

সম্প্রতি এই হরফের কেতাব যাহারা পড়ে উহারা প্রায়শ বঙ্গভাষানভিজ্ঞ নিম্নশ্রেণির মোসলমান। যথা -- কৃষক, মৎস্যজীবী, নৌকার মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি। যদিও ইহারা এই অক্ষরে লিখিত পুস্তক পড়িতে পারে এবং এই অক্ষরে চিঠিপত্রও লিখে, তথাপি আদমশুমারিতে (সেনসাসে) ইহারা "লিখা পড়া জানে না" এই শ্রেণিভুক্তই হইয়াছে। এখনও দলিলাদি কাগজপত্রে এই অক্ষর ব্যবহৃত হয় না এবং সরকারি চালান বা সমন প্রভৃতিতে এই অক্ষরের দস্তখত গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু ইহার এই হীন অবস্থা বোধহয় অধিক দিন আর থাকিতেছে না। পূর্বে বলিয়াছি চট্টগ্রাম ও ঢাকা পর্যন্ত ইতিমধ্যেই ইহার প্রসার হইয়াছে। শুনিতেছি এই অক্ষরে শ্রীহট্ট শহর হইতে নাকি একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারেরও প্রস্তাব চলিতেছে।

এই অক্ষরের পুস্তকাদির প্রচার এবং উন্নতিতে বঙ্গভাষার শুভানুধ্যায়ীবর্গের কোনো ভয়ের কারণ আছে কি না এই বিষয়ে কোনো কিছু বলিতে নানা কারণে আমি অনধিকারী। যাঁহারা অধিকারী তাঁহারা অবশ্যই বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবেন।

যাঁহারা এক-লিপি-প্রচার-কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া বঙ্গভাষা দেবনাগরাক্ষরে লিখিতে চান তাঁহারা এই সিলেট-নাগরীর সংবাদে আনন্দিত হইবেন কি বিবাদিত হইবেন, জানি না। আনন্দের কারণ, স্থানবিশেষে বাংলাভাষা কতকটা নাগরাক্ষরে লিখিত হইতেছে, আবার বিবাদের কারণ এই যে একই বঙ্গভাষা বোধহয় অদূর ভবিষ্যতে দুইটি বিভিন্ন আকৃতিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে।

আবার যাঁহারা বাংলা বর্ণমালার সংস্কারপ্রয়াসী তাঁহাদের নিকট সিলেট-নাগরী কাহিনি কীভাবে পরিগৃহীত হইবে বলিতে পারি না। তাঁহারা বোধহয় স্বীয় মত তেমন আন্তরিকতা সহকারে পরিপোষণ করেন না, নচেৎ "দেবনাগর" পত্রিকার ন্যায় তাঁহাদেরও কথা ও কাজের সমন্বয়সমূচক কোনো কিছু দেখিতে পাইতাম। যাহা হউক, বঙ্গের এক প্রান্তে প্রকারান্তরে তাঁহাদের মত-পরিপোষক কাজ হইতেছে দেখিয়া তাঁহারাও হৃষ্ট হইতে পারেন। তবে এই সংস্কারিত বর্ণমালা বাংলা অক্ষরে হইলেই বোধহয় তাহাদের সম্যক তৃপ্তি হইত। আমি কিন্তু কোনো প্রকারেই বর্ণমালার কাটছাঁট দেখিতে প্রস্তুত নহি। এই বর্ণমালাই আমাদিগকে -- হিন্দিভাষী, মারাঠিভাষী, বঙ্গভাষী প্রভৃতি আর্যসন্তানদিগকে -- একতার সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে -- তা সেই সূত্র যতই ক্ষীণ হউক-না কেন। এবং কোনো দিন আমরা সকলে এক হইলেও হইতে পারি, এই ক্ষীণ আশাটুকুও দিতেছে।

বঙ্গভাষার প্রসার অনেক কমিয়াছে। ইতিপূর্বে অসম উপত্যকার বঙ্গভাষাই পাঠশালায় পর্যন্ত অধীত হইত। এইক্ষণে এক গোয়ালপাড়া ব্যতীত অসমের সর্বত্র অসমিয়া ভাষার অধিকার হইয়াছে। পূর্বে গারো খাসি কাছাড়ি মণিপুরি প্রভৃতি পার্বত্য জাতীয়েরা বাংলা শিখিত এবং যখন উহাদের আপন ভাষায় কোনো পুস্তক লিখিত হইত, তখন বঙ্গাক্ষরেরই ব্যবহার হইত। এইক্ষণে কেবল যে বাংলা ভাষা উহাদের নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে, এমন নহে, উহাদের বর্ণমালাও বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি হইয়াছে। (একবার কোনো সাহেব সিভিলিয়ান বাংলা ভাষাটি

ইংরেজি অক্ষরে লিখিবার জন্য উদ্যম করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে জনৈক শাস্ত্রীও জুটিয়াছিলেন, তাঁহারা "দুর্গেশনন্দিনী" ইংরেজি অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশত সেই খেয়ালটা সত্বরই চাপা পড়িয়া যায়।) তাই ভয় হয়, বাংলার ভাঙা কপালে বুঝি বিধাতা আরো কিছু অশুভলিপি লিখিয়া রাখিয়াছেন। ❑

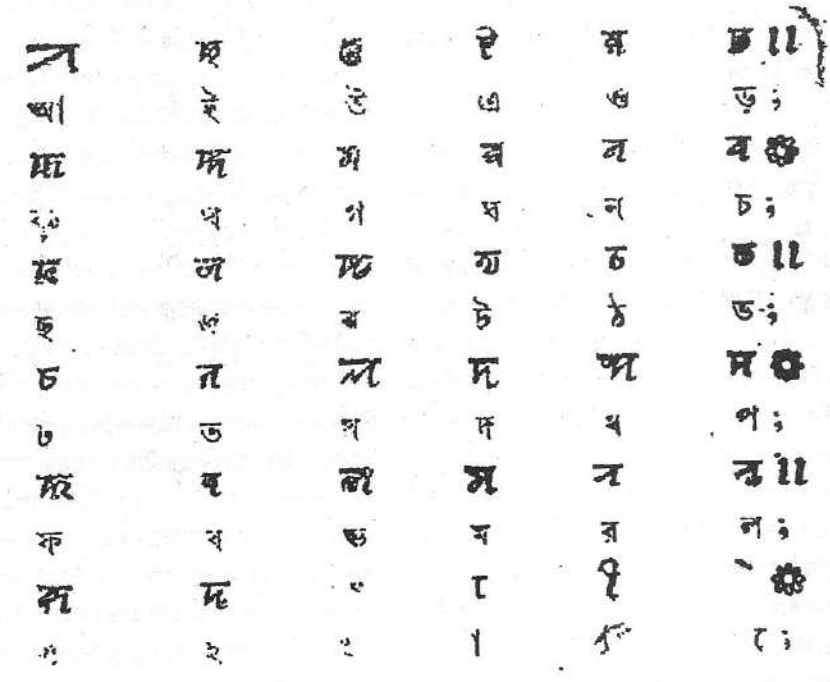

(চিত্র ক)

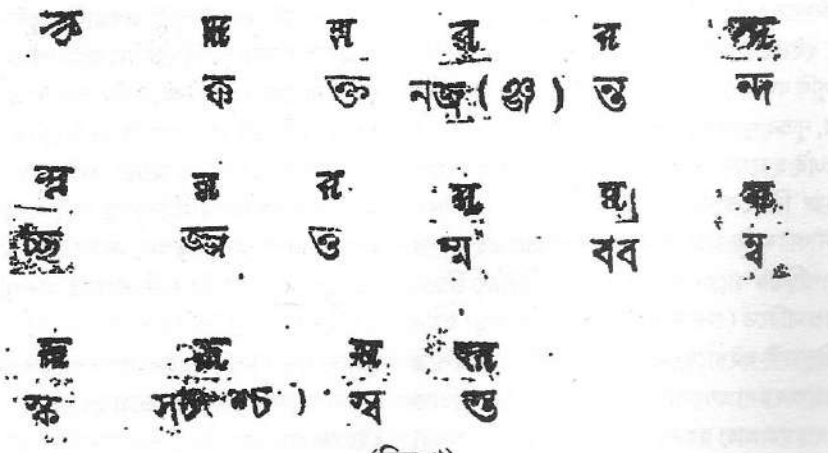

(চিত্র খ)

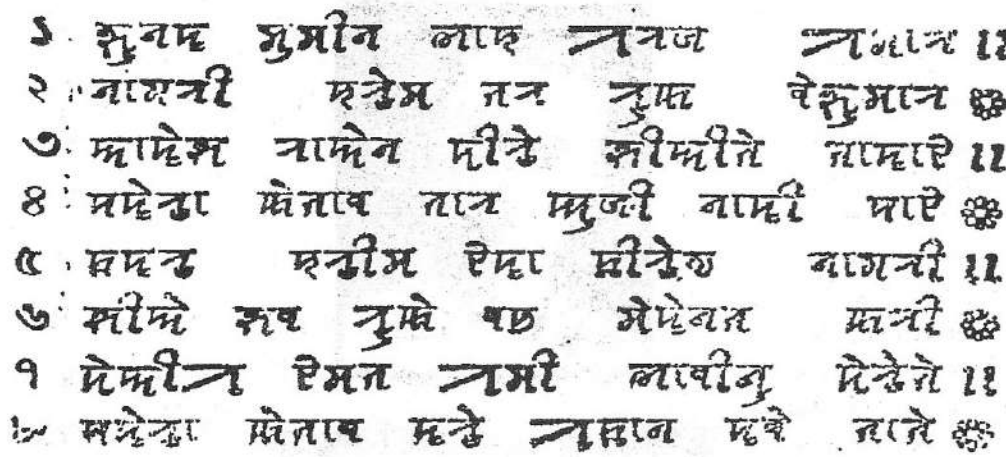

(চিত্র গ)

[সৌজন্য : কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রসূন বর্মন]

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

(১৮৯৪-১৯৫৫)

বিখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্র, রবিবার। পিতা বিরজানাথ ছিলেন কাত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। সেখানে রামনাথের ছেলেবেলা কেটেছে বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। শৈশবে পড়াশোনা হয়নি। প্রায় আট বছর বয়সে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা উভয়েই প্রয়াত। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হত। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

বানিয়াচং হাইস্কুলে পড়াশোনার পরে তরুণ বয়সেই বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত হন রামনাথ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলি পল্টন'-এর সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নেন ১৯২৪ সালে। সাত বছর পরে, যখন তিনি প্রকৃতপক্ষে কপর্দকহীন তখন ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেলে তাঁর বিশ্ব-পর্যটন শুরু হয়। অদম্য ভ্রমণস্পৃহায় রামনাথ চারটি মহাদেশ সফর করেন সাইকেলে চেপে এবং বেশ কয়েকবারের পর্যটনে ওইসব দেশের কারুজীবী, শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

যদিও রামনাথ বিদ্যালয়জীবনের পরে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বাংলা ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর রচনার মাধ্যমেই আমরা কামাল পাশার পুনর্গঠিত তুরস্কের বিষয়ে জানতে পারি এবং আধুনিক চিনের বিশাল তৎপরতার বিষয়েও তিনিই বাঙালি পাঠকদের প্রথম অবহিত করেন। অর্থবল না-থাকায় বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি কতবার কতরকম সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারও চিত্তাকর্ষক বিবরণে তাঁর ভ্রমণকাহিনিগুলি সমৃদ্ধ।

ভ্রমণকাহিনি-রচয়িতা হিসাবে রামনাথের অনন্যতা যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনই ভূপর্যটক হিসাবেও তিনি সার্থকনামা। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে 'তরুণ তুর্কী', 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন', 'জুজুৎসু জাপান', 'ইরানের আর্য' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ❑

ভারত-ভ্রমণ

(প্রথমাংশ)

রামনাথ বিশ্বাস

মণিপুর

১

জাহাজ থেকে নেমে আমাদের গন্তব্য স্থান ছিল পেলেল (Palel), মাত্র ঊনত্রিশ মাইল দূর। ভাবছিলাম এক দিনেই এই দূরত্বটুকু চলে যেতে পারব। সকালেই রওনা হলাম।

এক-পেয়ে পাহাড়ি পথ। আমার হাতে শুধু সাইকেল। ভাবছিলাম এটাকে ঘাড়ে করে নিতে আর কত কী পরিশ্রম হবে! আমার সামনে দিয়ে সকলেই চলে গেল, আমিই পেছনে পড়ে রইলাম। হাঁকডাক না-দিয়ে একাই চলছিলাম। সবাই অদৃশ্য হয়েছিল। শৈলেন ছিল সকলের সম্মুখে। ঘণ্টাখানেক চলার পর দেখলাম শৈলেন দাঁড়িয়ে আছে, আর তার কাছেই উত্তরপ্রদেশের মুসলমান লোকটি চিন্তিত মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাকে দেখামাত্র সে বলল, "আপনি আগে যান, বয়সে বড় কিনা! পথ যেন ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে!"

নিরক্ষর উত্তরপ্রদেশের দাড়িওয়ালা মুসলমানটিকে সর্বপ্রথমেই মৌলানা সাহেব বলে সম্বোধন করলাম। দুষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বাক্যের সমাবেশ! পাঞ্জাবে পাচককে হিন্দুরা পণ্ডিত বলে। আমি যদি লোকটিকে পাচকের কাজে নিযুক্ত করি এবং মৌলানা সাহেব সম্বোধন করি তাহলে দোষ হবে কি? এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছিলাম ঊনত্রিশ মাইল পথ চলতে বেশ বেগ পেতে হবে।

মৌলানা সাহেবের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমি তাকে বললাম, "মৌলানা সাহেব, জলের সন্ধান পেলেই বিশ্রাম করব। কিন্তু তুমি ভাই সঙ্গে যে-মোরগ আছে তার ঝোল ও দুটি ভাত করে দেবে।"

"আলবত! এটাই তো আমার কাজ", এই বলেই মৌলানা সাহেব আমার দিকে তাকাল।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সকলকে পেছনে রেখে আমিই আগে-আগে চললাম। ডানদিকে উঁচু পাহাড়, আর বাঁয়ে গভীর খাদ। পড়লেই মৃত্যু। সকলকে সাবধান করে দিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম।

পথটা ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছিল। সামান্য সূর্যালোক মণিমুক্তার মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। অতি কষ্টে দশটার সময়ে একটু প্রশস্ত স্থানে বিশ্রাম করতে বসলাম। চার-পাঁচজনের ভাত ধরে সেরকম একটা ডেকচি কিনেছিলাম। মৌলানা সাহেব মোরগ কাটতে চলে গেল।

সঙ্গী পর্যটকদের মধ্যে একজনের বয়স বেশি ছিল, তাকে চাল ধুয়ে আনতে বললাম। শৈলেন কাঠ জোগাড় করল এবং আগুন জ্বেলে চায়ের জল বসিয়ে দিল। ডাক-বিভাগের লোকেরা শুধু জল-ভাত খেল। আমাদের রান্না হতে এগারোটা বাজল। ঠিক বারোটার সময়ে রওনা হলাম। অষ্টম মাইল পেরিয়ে ডাকবাংলোয় রাত কাটাব মনস্থ করলাম। কোথাও বিশ্রাম না-করে চারটে পর্যন্ত চলার পর শৈলেন ফিরে এসে বলল, "পথে ভয়ের কারণ আছে।"

ডাক-বিভাগের লোকেরা আর অগ্রসর হতে নিষেধ করল। সকলের কথা উপেক্ষা করে মন্থর গতিতে সাইকেলটা ঘাড়ে করে চললাম। সাইকেলই আমার একমাত্র অস্ত্র। বাঘ আসুক, ভালুক আসুক, সর্বপ্রথমেই সাইকেলটা আক্রমণকারীর ওপর ফেলতে পারব এই ছিল ভরসা। শৈলেন পেছনেই ছিল, সে বলল, "খাটাসের গন্ধ পাচ্ছেন না?" 'খাটাস' বাঘের সঙ্গে থাকে।

আমার কিন্তু একটুও ভয় হলো না। সন্ধ্যার পূর্বেই আট মাইল পথ অতিক্রম করে ডাকবাংলোয় পৌঁছলাম।

ডাকবাংলো মানে একখানা কুঁড়ে ঘর। দশ হাত লম্বা এবং ছয় হাত চওড়া। সামনে সামান্য একটু সমতল ভূমি। ঘরটা খুঁটির উপরে তৈরি, নীচটা কমপক্ষে পাঁচ-ছয় হাত ফাঁকা। মই বেয়ে উপরে উঠতে হয়। হিংস্র জীব যাতে লাফিয়ে পড়ে গৃহবাসীর নাগাল না-পায়, এরূপভাবে ঘর তৈরি করা হয়েছে।

রাত আটটার পূর্বেই সকলের খাওয়া হয়ে গেল। চারখানা বাইসাইকেল ঘরের নীচেই থাকল। ঘরে পাহারার বন্দোবস্ত করলাম। দু-ঘণ্টা করে দুজন সজাগ থাকবে — এই হলো আমাদের বন্দোবস্ত।

রাত তিনটের সময়ে আমার পাহারা পড়ল। সঙ্গের লোকটিকে শুতে বললাম, সে শুল না। ধবধবে চন্দ্রালোকে বনের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ঘর থেকে নেমে পরিষ্কার স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। পুবদিকে মেঘমালা ছিল আমাদের নীচের লেভেলে, সেজন্য মেঘের চলাফেরা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমরা যেন পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে রয়েছি! কিছুক্ষণ পরে সহসা একটি স্ত্রীলোকের কান্না শুনতে পেলাম।

স্ত্রীলোকের কান্না কি বাসের ঘর্ষণ, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। স্ত্রীলোকের কান্না পুরুষকে যেমন উত্তেজিত করতে পারে, তেমন আর কিছুতেই উত্তেজিত করতে পারে না। উত্তেজিত হয়েছিলাম বটে কিন্তু কোন্‌দিকে যেতে হবে? যদি নাগারা আক্রমণ করে তাহলে অস্ত্র কোথায়? একা কী করে যাই? নানা চিন্তায় ঘুমের নেশা কেটে গিয়েছিল। সকাল পর্যন্ত কাউকে ডাকিনি। ভোর হবার পর চা তৈরি করে খেয়ে সকলকে ডাকলাম। না-খেয়ে রওনা হওয়া মহা অন্যায়। মৌলানা সাহেব রান্না করল, আমরা পথ ধরলাম। উদ্দেশ্য, আট মাইল দূরের ডাকবাংলোতে রাত কাটানো।

পথের কষ্ট ক্রমেই যেন বেড়ে চলল! বাঁদিকের খাড়ি গভীর হচ্ছিল। আমরা উপরে উঠছিলাম, কাজেই খাড়ি গভীর হবে এটাই স্বাভাবিক। ঘন বাঁশবনের ভেতর দিয়ে চলছিলাম। কারো মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছিল না। ঘণ্টায় আধ মাইলের বেশি চলতে পারছিলাম না। একপেয়ে পথ ক্রমেই ছোট হতে শুরু করল। আমরা ক্রমেই খাড়ির পাশ দিয়ে চলছিলাম। কাউকে কোনো উপদেশ দিতে হলো না। সকলেই হাতে প্রাণ রেখে পা টিপে টিপে চলছিল। অবশেষে ঘণ্টায় আধ মাইল যাওয়াও সম্ভব হচ্ছিল না। অন্য দুজন পর্যটক নিয়েই মহা বিপদে পড়েছিলাম। এদের পাহাড়ে চড়া অভ্যাস না-থাকায় পা কাঁপছিল। ভয়ে তারা ঈশ্বরের নাম করছিল।

প্রায় দু-ঘণ্টা পথ চলে আমরা এই বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে একটু ফাঁকা জায়গায় বসে পড়লাম। মৌলানা সাহেব 'ইয়া আল্লা' বলেই মাটিতে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর দু-হাত তুলে আল্লার করুণা ভিক্ষা করল। বোধহয় লজ্জায় অন্য দুজন মুসলমান পর্যটক মৌলানার মতো কিছুই করল না বটে কিন্তু এরূপ পথে চলার জন্য দুঃখিত হলো। তাদের পক্ষে ফিরে যাওয়ারও কোনো উপায় ছিল না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সকলেই চাঙ্গা হলো, শুধু আমিই শুয়ে রইলাম। শেষরাত্রে না-ঘুমনোর জন্য শরীর দুর্বল হয়েছিল। রান্না হয়ে গেলে খেয়ে আবার রওনা হলাম। কিন্তু কোনোমতেই আশা করতে পারি না যে ডাকবাংলোয় সন্ধ্যার পূর্বেই পৌঁছে যাব। সুখের বিষয়, পথটা বেশ চওড়া, তাই সকলেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছিলাম। একজন পর্যটক সাইকেল চালাতে সক্ষম হয়েছিল। সে ভাবছিল, সেদিনই পেলেল পৌঁছনো যাবে। কিছুটা গিয়ে সে ফিরে এসে সংবাদ দিল, পথে নাগা দাঁড়িয়ে আছে। নাগার ভয়ে সকলেই ভীত। আমাকেই এগিয়ে যেতে হলো। নাগা ছিল সজ্জন। তার বাড়ি কাছেই ছিল। সকলকে পথে রেখে তার বাড়িতে গেলাম। দেখলাম, একটি জংলি শুয়োর সবেমাত্র হত্যা করে এনেছে। জংলি শুয়োর আমার প্রিয় খাদ্য, কিন্তু সঙ্গে মুসলমান থাকায় মাংস কিলনাম না, চাল কিনে আনলাম। শুয়োরের কথা কারো কাছে বললাম না।

নাগার শরীর ধূসর বর্ণের। নাক-মুখ-চোখ, এমন-কি পায়ের গোছা পর্যন্ত মংগোল ধরনের। নাগা যে খাঁটি ব্রাউন মংগোলিয়ান তাতে আর সন্দেহ থাকল না। বাঙালির মধ্যে ব্রাউন মংগোলিয়ানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। শুধু কয়েকটি জেলায় ব্রাউন মংগোলিয়ানের সংখ্যা কম, নতুবা সর্বত্রই সংখ্যায় অনেক। নাগার শরীরের গঠন নিয়েই অনেকক্ষণ চিন্তা করতে হলো। এতে সময় কাটছিল। পথ চলার কষ্ট মোটেই হচ্ছিল না। দ্বিপ্রহরে আমরা বিশ্রাম এবং আহার করার জন্য একটি বেশ পরিষ্কার স্থানে বসলাম। নিকটেই জল পাওয়ায় রান্নার কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।

আবার পথ চলতে আরম্ভ করলাম। এবার পথ অনেকটা সঙ্গিন হতে লাগল। অবশেষে একপেয়ে পথ এত ছোট হলো-

যে কিছুটা চলে একস্থানে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। উদ্দেশ্য, সাথিরা এই দুর্গম পথ অতিক্রম করার পর আমি রওনা হব। সঙ্গের মুটিয়া থেকে পোস্ট অফিসের কেরানি পর্যন্ত চলে যাবার পর অতি সন্তর্পণে সামান্য পথটুকু অতিক্রম করলাম। মনে হলো, একেই বলে ভ্রমণ! অন্য কেউ হলে এই পথের কথায় অন্তত পাঁচ পৃষ্ঠা পূর্ণ করত। ফেনিয়ে লেখার অভ্যাস নেই, সেজন্যেই সংক্ষেপে কথা শেষ করতে হলো।

আরো একটু চলে সবাই দাঁড়াল এবং পাশের উন্মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইল। কাছে গিয়ে দেখি, এমন দৃশ্য যে-কোনো মানুষের মন আকর্ষণ করে। সামনেই একটি সমুদ্র। সমুদ্রের জলরাশি ক্রমাগত সরছে, নূতন জল সমুদ্র পূরণ করছে। এসব হলো মেঘের খেলা। আমরা তখন প্রায় চার হাজার ফুট উঁচুতে উঠেছি। নীচে চিন্দুইন ভ্যালি। চিন্দুইন ভ্যালি মেঘাচ্ছন্ন। বোধহয় বৃষ্টি হচ্ছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সময় নষ্ট করা চলে না।

রেঙ্গুনে পোনার নাচ নামে একরকম নৃত্যের প্রচলন আছে। নৃত্যকারী মণিপুরি বালিকা। তারা ফুলের এবং আকাশের ভাসমান মেঘমালা নিয়েই বাংলাভাষায় গান রচনা করে এবং সেই গান বাঙালি মুসলমানদের কাছে গেয়ে বেড়ায়। সবাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা দিয়ে পদ্যের ছন্দ পূরণ করত। পোনার নৃত্য একদিন মাত্র দেখেছিলাম। এমন সুন্দর করে প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনা করা যেতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। আজ সেই প্রাকৃতিক বর্ণনার গানের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অবিকল মিল রয়েছে দেখে পোনার গান যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য হলাম। আনাম রাজ্যের থান্‌হোয়া নামক স্থানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের যে-দৃশ্য দেখা যায়, এখানেও প্রায় সেরূপ দৃশ্যই আবহমানকাল দেখতে পাওয়া যাবে।

আমরা যে-পথ দিয়ে এসেছিলাম সেই পথে দুখানা মোটর গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৌলতে তেমন প্রশস্ত রাস্তা তৈরি হয়েছে। হবে না কেন? ব্রিটিশের দরকার হয়েছিল তারা পথ তৈরি করেছে, কিন্তু এই পথ আর বন্ধ হবার উপায় নেই। এই পথ বড়ই দুর্গম। স্টিলওয়েল রোড যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে যে-পথ এসেছে — সেই পথ যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, এই পথও তেমনই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বর্তমানের ইন্ডিয়া সরকার এই পথের প্রতি সুবিচার করছেন না মোটেই। পথটা বন্ধ হয়ে গেলেই যেন ভালো হয়! কিন্তু সেদিন চলে গেছে বন্ধু! লক্ষ আমেরিকান চেষ্টা করুক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নতির পথে বাধা দিতে পারবে না। একটি পদাঘাতে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ লোপ হবে। টামো-পেলেল রোড অক্ষয় হয়ে থাকবে। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোথায়? এক মাইল, দুই মাইল নয়, সাতশো মাইল প্রশস্ত গভীর জঙ্গল দিয়ে ভারতের পূর্বদিক সমাচ্ছন্ন। বেহার প্রদেশের মতো তিনটে উর্বর প্রদেশ খালি পড়ে আছে, মানুষ সেই এলাকাতে নেই বললেই চলে। অথচ সর্বত্র খাদ্যের অভাব হবে বলে মিথ্যাবাদীরাই চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। টামো-পেলেল রোডের প্রতি অবহেলা করে লাভ হবে না।

সকলের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা হয়ে যাবার পর আমরা আবার চললাম। পথের দু-দিকে সাপের চলাফেরা অনুভব হলো। মনে হলো, কোথাও হাজার হাজার সাপ লুকিয়ে আছে। শৈলেনই সর্বপ্রথম টের পায়, আমাকে সাপের কথা বলেনি। কারণ, সে জানত, এই জীবকে যতটুকু ঘৃণা করি ততটুকু ভয় করি। সাপের ঔষধ লাঠি, আমাদের কারো কাছে লাঠি ছিল না। সাপ-বসতিপূর্ণ স্থান অতিক্রম করে এলাম বটে কিন্তু সাপ দেখতে পেলাম না। পরের দিন দুটো সাপকে শৈলেন মেরেছিল। দুটো সাপই ছিল বিষাক্ত।

ঠিক বারোটার সময়ে আমরা রান্নার আয়োজন করলাম। সকলে খাওয়া হয়ে গেলে উঠব ভাবছি এমন সময় একটি ইগল পাখি গা ঝাড়া দেওয়ায় সকলেই ভীত হয়ে পড়ল। ইগল পাখির অনেক নাম আছে। এ-অঞ্চলের লোক ইগল পাখিকে 'হাওয়াল' বলে। এই পাখি ঘণ্টায় ঘণ্টায় শব্দ করে। যারা ঘড়ি ব্যবহার করে না তারা হাওয়ালের ডাক শুনে ঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারে।

সামান্য বিষয়ে সকলকেই চমকে উঠতে দেখে অনেক কথাই চিন্তা করতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এসব বোধহয় বনের রীতি। চমকে উঠতে হয় সব কিছুতেই। বনে ভ্রমণ করা অভ্যাস ছিল বলেই চমকে উঠলাম না। ইগল পাখির ভয় চলে যাবার পর আবার পথ চলতে আরম্ভ করলাম। এবার পথটা খুবই খাড়ি। সাইকেল ঘাড়ে করে চলতে অসুবিধা হচ্ছিল। সকলেই আস্তে চলছিল। এমন পথে সাইকেল হাতে করে অথবা ঘাড়ে করে নেওয়া বড়ই বিপজ্জনক। ঘণ্টা দুই চেষ্টা করার পর আমরা একটু সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম। সকলেই পরিশ্রান্ত। আট মাইল পথ, আর কয় ঘণ্টা চললে বিশ্রাম-গৃহের দেখা পাওয়া যাবে তা

ডাকবাহকদের সকলেই জিজ্ঞাসা করছিল। অনেকেই টেলিগ্রাফ-লাইনের থাম গুনত, কিন্তু এসব গোনার কোনো মানে হয় না। সবগুলো থাম আমাদের পাশ দিয়ে ছিল না। কোনো থাম পর্বতের উপরে আর কোনো থাম পথের পাশে। সকলেই সবসময় থাম গুনতে পারছিল না। পথের কাঠিন্য থামের কথা ভুলিয়ে দিচ্ছিল। অনেকেই অধৈর্য হয়ে পড়ছিল, কিন্তু ফিরে যাবার উপায় ছিল না, সেজন্য অধৈর্য হওয়ারও কোনো মানে ছিল না।

সন্ধ্যা হয়ে গেল, ডাকবাংলোর দেখা পেলাম না। মনে হলো যেন ঘরটা ফেলে এসেছি। এটা আমার ভুল। পথের পাশেই ডাকবাংলো থাকে, ফেলে আসার উপায় ছিল না। রাত আটটার সময়ে আমাদের সেদিনের ভ্রমণ শেষ হলো। ক্রমাগত তেরো ঘণ্টা হেঁটে আট মাইল পথ উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলাম। রান্না করার মতো শক্তি কারো ছিল না। উপায়ান্তর না-দেখে চায়ের জল বসিয়ে দিলাম। চা হয়ে গেলে সকলকেই চা খেতে ডাকলাম। চা খেয়ে অনেকের শক্তি ফিরে এল। সকলেই রান্নায় মন দিল।

স্নান করে বিশ্রাম করছিলাম। চাঁদের আলো বনের সর্বত্র নূতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছিল। অভাব ছিল না, চাঁদের আলোতে বনের সৌন্দর্য অনুভব করার মতো মন ছিল। খেয়ে ঘুমোলাম না। সাথিদের উৎসাহিত করার জন্য বলেছিলাম, "আর দু-দিন, তারপরই আমরা পেলেল পৌঁছব, সেখান থেকে মণিপুর মাত্র আটাশ মাইল। সুন্দর পথে চলতে একটুও কষ্ট হবে না। যেদিন পেলেল পৌঁছব সেদিনই ইমফল রওনা হব।" এই রকমের কথা বলে অনেকের মনেই সাহস ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলাম। রাত্রের পাহারার জন্য কাউকে অনুরোধ করলাম না। দরজার সামনে শুয়ে রইলাম। অন্যান্য সকলেই ভেতরে শুল।

রাত বোধহয় একটা হবে। হঠাৎ একজন পর্যটক চিৎকার করে বলল, ঘরে ভূত আছে। কেউ ভূতের সন্ধান করল না। চন্দ্রের আলো ঘরে প্রবেশ করছিল এবং যেখানে আমাদের গাঠুরি রাখা হয়েছিল সেখানে চাঁদের আলো পড়ে মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। রাত নির্বিঘ্নে কাটল। সকাল হতেই নূতন শক্তি নিয়ে পুনরায় রওনা হলাম। এদিকে পথ প্রশস্ত, সেজন্য খাড়িতে পড়ে যাবার ভয় ছিল না। নয় মাইল পথ চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, কিন্তু তত কষ্টবোধ হচ্ছিল না।

আজকের ডাকবাংলো বেশ বড়, চারচালা একখানা বড় ঘর। মাটির মেঝে গোবর দিয়ে লেপা। দরজা ছিল না, দ্বারোয়ানও ছিল না। জল কাছেই ছিল। সকলেই আনন্দের সঙ্গে রান্না করল। পোস্ট-অফিসের কর্মচারীরা এখান থেকে ভিন্ন পথ ধরল। যাবার সময় বলে গেল, রাতে যেন সাবধানে থাকি। পাহারার বন্দোবস্ত হলো।

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ শৈলেন ডাকল। উঠে দেখি, একটি নাগা স্ত্রীলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রীলোকটিকে অন্ধকার থেকে প্রাঙ্গণে আসতে বললাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না গভীর রাতে স্ত্রীলোক কেন বেরিয়ে আসছে! তার-যে কোনো বদ মতলব ছিল, তাও বুঝতে পারলাম না। অবশেষে চলে যেতে বললাম। স্ত্রীলোকটি চলে গেল বটে কিন্তু ঘুম হলো না।

চতুর্থ দিন সকালবেলায় রান্না করা হলো না। ঠিক হলো, দুপুরে রান্না করা হবে। সকাল থেকে হেঁটে চার মাইল পথ চলার পর আর চলতে পারলাম না, তখন বেলা একটা। সকলেই রান্নায় নিযুক্ত হলো। রান্না হয়ে গেলে আমরা বেশিক্ষণ বিশ্রামের জন্য কাটাতে পারলাম না। আজই আমরা পেলেল পৌঁছতে পারব মনে করলাম। সম্ভবও হলো। বাইসাইকেল চালাতে পারলাম। তিনটের আগেই আমরা পেলেল পৌঁছলাম।

পেলেল সমতল ভূমিতে অবস্থিত। মস্ত বড় গ্রাম। গ্রামের যা-কিছু দেখার সবই দেখলাম। একটি বাড়ির সামনে বিশ্রাম করার সময় একটি সাপ চলে যেতে দেখে শৈলেন সাপকে আক্রমণ করে হত্যা করল। সাপটাকে দূরে ফেলে দিতে বললাম।

গ্রামের বাসিন্দা মণিপুরি। মণিপুরি এবং অন্যান্য মংগোল জাতির মধ্যে পার্থক্য অনেক। এদের রক্ত শতকরা ত্রিশভাগ টিবেটো-বর্মন এবং সত্তর ভাগ ব্রাউন মংগোলিয়ান। তাই বেঁটে এবং তেমন ফরসা নয়। কিন্তু যখনই মণিপুরি রক্ত অ-মংগোলিয়ান রক্তের সঙ্গে মেশে তখনই নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য দেখা যায়। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলায় মণিপুরি রক্তের সংমিশ্রণে যাদের শরীরের গঠন, তাদের শরীর খুবই সুন্দর। নাক, মুখ, চুল, শরীরের গঠন অনেক সময় নরডিকদের হার মানিয়ে দেয়। আমার অনেক আত্মীয় আছেন যাঁদের সঙ্গে মণিপুরি রক্তের সংমিশ্রণ থাকায় শরীরের গঠন ইন্দো-এরিয়ানদের চেয়েও ভালো দেখায়।

মণিপুরিরা পুরনো জাতি। মহাভারতে তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। মহাভারতের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন, মহাভারতের যুগ ছিল চার থেকে পাঁচ

হাজার বছর আগে। তখন হয়তো চিন্দুইন-ভ্যালি জলাবৃত ছিল। হয়তো মণিপুরিরা জলপথে টামো হয়ে ইমফলে পৌঁছেছিল। ইমফল শব্দের সঙ্গে হাইনান্ দ্বীপের শব্দের মিল রয়েছে কিন্তু কতকগুলি কারণে সেই মিলের কোনো মূল্য থাকে না। এখনই সে-কথা বলছি।

পেলেলে থাকা হলো না। বিদায়ের আগে কতকগুলি পুরনো বিল্ডিং দেখলাম। বিল্ডিং সবই চতুষ্কোণ এবং গড়নে ক্ষুদ্রাকৃতি। আনাম ধরনে ঘর তৈরি। আনাম জাতিটাই হলো চতুষ্কোণী। ত্রিভুজ তাদের অভিধানে নেই। আমরা যেমন মন্দিরের উপর দিকটা সরু ও উঁচু করি, আনাম জাতি সেরূপ করে না। মেঝে যেমন ফ্ল্যাট, ছাদও তেমনই ফ্ল্যাট। পুরনো বিল্ডিংগুলির ইট পরীক্ষা করে দেখলাম, এসব দুশো বছরের বেশি পুরনো নয়।

আমরা রওনা হলাম পেলেল ছেড়ে। রাত ন-টার সময়ে এক মণিপুরি মুসলমান গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামবাসী আমাদের আমন্ত্রণ করল, আমরা নিমন্ত্রণের আয়োজন করলাম। মাংস-ভাতের বন্দোবস্ত হলো। রাত কাটাব মনে করে সকলেই শুয়ে রইলাম কিন্তু চোখের পাতা বুজতে না-পেরে পথ চলাই সকলে পছন্দ করল। আমরা চারজন সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাইকেল চালালাম।

তখন রাত তিনটে। করতাল, খোল ও মন্দিরা বাজানোর শব্দ শুনছিলাম কিন্তু গান শুনতে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমরা কীর্তনের আসরে পৌঁছলাম। সকলেই আমাদের সমাদর করে বসাল। মন দিয়ে গান শুনছিলাম। পুরুষের গান — একজনও স্ত্রীলোক ছিল না। গানের সুর অনুধাবন করাই ছিল আমার লক্ষ্য। এত জোরে এরা গান গাইতে চেষ্টা করছিল যে স্বর সরু হয়ে অবশেষে অশ্রুত হয়ে আসছিল। সবগুলি গানেই কালোয়াতি ছিল। কালোয়াতি নিশ্চয়ই ইন্দো-এরিয়ান অথবা দ্রাবিড়। কালোয়াতিতে দ্রাবিড় স্বভাব ফুটে উঠছিল। এরা কোথা থেকে দ্রাবিড়ের কালোয়াতি পেল তা-ই ছিল সমস্যার বিষয়। গান গাইছিল বাংলায়, বাংলা গান যদি তামিল সুরে গাওয়া যায় তাহলে অনেকটা অশ্রাব্য বলেই মনে হয়।

যতগুলি গায়ক উপস্থিত ছিল তাদের দেখে প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রেণির লোক বলেই মনে হয়েছিল। গান বাংলা, সুর তামিল, পরিচ্ছদ খাঁটি অসমিয়া বা বাঙালি। গানের আসরে বসেই ঠিক করে নিয়েছিলাম, মণিপুরিরা যে-জাতির লোকই হোক-না কেন, যে-সভ্যতা তারা পালন করে তা হলো মিশ্র সভ্যতা।

মণিপুরের পেলেলের কাছে মুসলমান গ্রাম দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। এরা কেমন করে মুসলমান হলো জানতে ইচ্ছা হয়েছিল। কী করে গ্রামের লোক মুসলমান হয়েছিল কেউ বলতে পারল না, কিন্তু এদের সামাজিক অবস্থা দেখে দুঃখ হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানেরা হিন্দুর প্রতি যে কেন বীতশ্রদ্ধ? সম্ভবত সামাজিকতার অত্যাচারই তার একমাত্র কারণ।

কীর্তন সমাপন দেখে আমরা আবার রওনা হলাম। এবার কোথাও না-থেমে একেবারে ইমফল পৌঁছলাম।

২

মণিপুরের পেলেল গ্রামে ইসলাম মতবাদের প্রচলন দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। অবশ্য এ-সম্বন্ধে আরো একটু আলোচনা না-করলে চলবে না। কিন্তু পেলেল পেরিয়ে এসে সামনে যে-ভূখণ্ড দেখতে পেলাম তা দেখে আরো আশ্চর্য অনুভব করেছিলাম। চলার সময় চারজন একত্রে চলছিলাম সেজন্য ভূমিতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করবার অথবা মাটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করার সময় ছিল না। মনে হচ্ছিল, পেলেল থেকে আরম্ভ করে ইমফল পর্যন্ত ভূভাগ যে-কোনো সময়ে তলিয়ে যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এটা চুনা পাথরের পচা মাটি মাত্র। 'ইভাপোরেট' করে মাটি হয়েছে। ইমফলে পৌঁছে মনে হলো, শহরটা মোটেই পুরনো নয়, অতি আধুনিক অর্থাৎ এই শহর চার-পাঁচশো বছর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল।

মহাভারত কাব্যগ্রন্থ। এটাকে মাইথোলজির অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। কাব্যগ্রন্থে অনেক সময়ে বাস্তবের গন্ধ থাকে। মহাভারতের যুগে আর্যরা এদিকে এসেছিল, সে-কথা মহাভারতে বলা হয়েছে। আমার মনে হয়, মহাভারতের যুগে বর্তমান ইমফল ছিল হয় জলমগ্ন, নয়তো খাড়ি। পেলেল ছিল তখনকার দিনের আবাদি ভূমি। মহাভারতের যুগে পেলেলের সৌন্দর্য ছিল অসীম। একদিকে বর্তমান চিন্দুইন-ভ্যালি তখন নিশ্চয়ই জলমগ্ন ছিল, অন্যদিকে ছিল ইমফল-ভ্যালি যা হয় জলমগ্ন নয়তো খাড়ি ছিল। এমন স্থানের বাসিন্দা বর্তমান মণিপুরিরা ছিল না, ছিল কাছাড়ি অর্থাৎ দ্রাবিড় জাতের লোক। কাছাড়ি, কোচ এবং ত্রিপুরার রাজবংশ সবাই ছিলেন দ্রাবিড়। সেজন্য রাক্ষস আখ্যা দেওয়া হয়। আর্যরা সবসময়েই কালো লোককে হীন মনে করত। ইমফলে

পৌঁছে দ্রাবিড় জাতের লোকের অন্বেষণে ছিলাম। কয়েকটি গ্রামে দ্রাবিড়ের দেখাও পেয়েছিলাম। যাদের দেখা পেয়েছিলাম, তাদের কারো উপাধি বর্মন অথবা দেববর্মন ছিল না। দেব, দত্ত, দে এবং মুসলমানি নাম — এসবই দেখেছি। মুসলমানদের মধ্যে দু-একজন প্রকৃত দ্রাবিড় দেখেছি। কিন্তু তাদের ভাষা এতই সংস্কৃতবহুল ছিল-যে তাদের হয় বাঙালি, নয়তো অসমের বাসিন্দা ব্যতিরেকে আর কিছুই বলা চলে না।

খুব বেশি রাজদ্রোহী ছিলাম বলে ভারতীয় কোনো রাজার সঙ্গে দেখা করতাম না। কিন্তু মণিপুরের রাজবংশের রক্তের পরিচয় পাওয়া চাই, সে-উদ্দেশ্যে রাজবংশের কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা করি। সর্বত্র একাকার অর্থাৎ মিশ্র রক্ত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনি। নিরাশার কারণ ছিল না। একটি মণিপুরি বিদ্যালয়ে গিয়ে অনেক ছাত্র দেখতে পেলাম যারা বাস্তবিকই টিকেন্দ্রজিতের বংশধর বলে দাবি করতে পারে। টিবেটো-বর্মনদের যুদ্ধপ্রধা 'পলায়ন এবং হয়রান করা' নিয়ম প্রচলিত ছিল। টিবেটো-বর্মনরা শুধু নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করার সময় শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধ করত। উত্তরবাসী এবং দক্ষিণবাসীরা স্বদেশী-বিদেশী নির্বিশেষে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করত এবং এখনও করে। চেঙ্গিস খান, কুবলাই খান এবং অন্যান্য মংগোল জাতির লোকের মধ্যে আক্রমণ-প্রথা দেখা যায় কিন্তু সে-আক্রমণকে আক্রমণ বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে তা লুঠতরাজের শামিল। প্রিমিটিভ, মংগোল ও পিগমি, হটেনটটদের মধ্যেই গেরিলা-যুদ্ধের প্রচলন ছিল। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে সে-বিষয়ও মনে রাখা দরকার। কৃষ্টি মিনিটে পরিবর্তিত হয়।

মণিপুরিদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম, এমন-কি ইসলাম ধর্মেরও প্রচলন আছে এবং এই দুটি ধর্মই বিশেষভাবে এদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য মংগোল জাতি অবতারবাদকে যেমন পায়ের জুতোর মতো মনে করে, এরা ঠিক তেমন মনে করতে পারে না, এমন-কি সেরূপ চিন্তাও করতে পারে না। এর সঠিক কারণ হলো দ্রাবিড় রক্তের সঙ্গে মংগোল রক্তের সংমিশ্রণ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে দ্রাবিড় সভ্যতাই বুঝতে হবে। আপাতত আর্য এবং আর্য সভ্যতা নিয়ে সমালোচনার অবসর নেই।

মণিপুরের অন্তঃস্থলে রায়সাহেব পরিচালিত একটি হোস্টেল ছিল। তাতেই চারজন আশ্রয় নিয়েছিলাম। প্রথমত দৈনিক আড়াই টাকা হারে চার্জ করা হয়েছিল, পরে আমাদের পরিচয় পেয়ে সবইটাই মকুব করেছিলেন। থাকা-খাওয়ার খরচ দেবার মতো সংস্থান আমাদের ছিল। কিছুই দেওয়া হয়নি বলে শৈলেন দুঃখিত হয়েছিল, আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। উভয়ের মানসিক বৃত্তি এক ছিল না। তখনকার দিনে যাঁরা সরকারি উপাধি পেতেন তাঁরা সবাই-যে দেশের উপকার অথবা মঙ্গল করে উপাধি পেতেন তা নয়, অমঙ্গল এবং অনাচার করেই বেশির ভাগ লোক উপাধির অধিকারী হতেন। অত্যাচারী এবং দুষ্টকে ধনতন্ত্রবাদী ভালোবাসে, কমিউনিস্টরা দয়া করে। এদের কারো মতের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল না, সেজন্য নির্বিকার ছিলাম।

মণিপুরিদের মধ্যে চিঁড়ে, আখের গুড় ও দইয়ের প্রচলন অত্যধিক। কলার প্রচলনও বেশ রয়েছে। শাকসবজির মধ্যে মণিপুরি 'লাইপাতা' বিখ্যাত। মণিপুরি লাইপাতা পশ্চিমবঙ্গে অল্পই জন্মায়। অনেকে মণিপুরি লাইয়ের নিকৃষ্ট শ্রেণির লাইপাতাকে শস্যপাতা বলে। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ইত্যাদি অঞ্চলের কোথাও লাইপাতার গাছ দেখেছি বলে মনে হয় না। অতএব লাইপাতা, লাইপাতারূপেই রইল। অভিধান খুঁজে প্রতিশব্দ বের করতে হলে সময় নষ্ট করা হবে মাত্র।

লাইপাতার প্রচলন মংগোলিয়ান জাতি-অধ্যুষিত প্রায় সকল দেশেই রয়েছে। সাধারণত মণিপুরিরা ভাতের সঙ্গে মুলো, লাইপাতা এবং এই শ্রেণির সবজি বেশি ব্যবহার করে। বাজারে মোরগ, হাঁস, পায়রা, শুকনো মাছ, দুধ, দই এসবও পাওয়া যায়। বৈষ্ণবরা শুকনো মাছ খায়। হাঁস, পায়রা, মোরগ এসব খায় না। মণিপুরিদের মধ্যে সকলেই বৈষ্ণব নয়। অবতারবাদে অবিশ্বাসীর সংখ্যাও বেশ রয়েছে। তারাই হাঁস, পায়রা, মোরগ এবং আরো অনেক রকমের মাংস খায়। একজন অবতারবাদে অবিশ্বাসীর সঙ্গে দ্বিতীয় দিনেই দেখা হয়। তার হাতে ছিল একটি মোরগ। আমি ভেবেছিলাম লোকটি মুসলমান। সে পরিষ্কার বাংলা বলছিল। সে বলছিল, "তোমাদের দেশে যতগুলি অবতার আছে, আমাদের দেশে তাদের কারো প্রতি কোনোরূপ সহানুভূতি দেখানো হয় না।"

লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম — সে এমনই একটি স্থানের লোক যেখানে মণিপুরের প্রতাপান্বিত টিকেন্দ্রজিতেরও প্রাধান্য বিস্তারলাভ করেনি। সেই এলাকা এতই পর্বতসংকুল যে, শুধু নাগা ও মণিপুরের আদিম অধিবাসীরা বাস করে। জাপভো পর্বতের পূর্বদিকে এমন কতকগুলি গ্রাম আছে যেখানে

হয়তো তখন পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রাধান্য মোটেই প্রসারিত হয়নি। বর্তমানে নিশ্চয়ই সেখানে সভ্যতার প্রসারণ হয়েছে, সেইসঙ্গে অবতারবাদেরও হয়তো বিস্তারলাভ ঘটেছে।

সেই লোকটির কথা শুনে অবাক হয়েছিলাম। সে বৈষ্ণব অথবা মুসলমান মণিপুরিদের গোলাম বলত। দুঃখের সঙ্গে বলছি, খাস ইমফলেও কয়েকজন মুসলমান মণিপুরির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারা সকলেই সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। কাজেই এতই হিন্দুবিদ্বেষী যে, যে-কোনো প্রকারে হিন্দুর ক্ষতি করতে পারলে আনন্দ পেত। অবশ্য এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাদের চিন্তার মোড় ফেরাবার ভার মণিপুরি প্রগতিশীলদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। মণিপুরে তখন সবেমাত্র প্রগতিশীল চিন্তাধারা প্রবেশ করেছিল। ভারতের কোথাও প্রগতিশীল চিন্তার নামগন্ধও ছিল না, অথচ মণিপুরে কী করে উন্নত চিন্তার গন্ধ পৌঁছল, বাস্তবিকই তা চিন্তার বিষয়। চিন্তা করতে হবে না। কয়েকজন বাঙালি মণিপুরে প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিস্তার করেছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে পরে বলা হবে।

"ব্লাডি হেল! মণিপুরি নৃত্য আবার কী রে? শুয়ে থাক্। এসব দেখে সময় নষ্ট করা কোনোমতেই তোমার পক্ষে ভালো দেখায় না", এই বলে শৈলেনকে শাসিয়েছিলাম, কিন্তু জানতাম না যে সে আমার পথে চলছিল না। দেশ স্বাধীন করা যার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাকে মণিপুরি নৃত্য দেখতে হয়ই। আমিও গেলাম সেই নৃত্য দেখতে। এখানে খাঁটি কীর্তন হচ্ছিল। দুটি মণিপুরি পুরুষ নবদ্বীপের অনুকরণে খোল বাজাচ্ছিল। তাদের লম্ফঝম্প বেশ লাগছিল, তিনটি যুবতী গান গাইছিল। তাদের গানের সুরতাল যদিও কীর্তনের ছিল, তবু মাঝে মাঝে "রে" উচ্চারণ বেশি হওয়ায় শুধু আমার মনেই বোধহয় চিন্তা সৃষ্টি করছিল। বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী — এই তিনটি সুর বাঙালির নিজস্ব। এই তিনটি সুরের ভুলভ্রান্তি অনুভব করবার শক্তি আমার ছিল।

আসরে ছিলেন একজন বাঙালি ধনী ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে ভাবের আবেগে তিনি ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। ফুলের পরিবর্তে যদি নোট ছড়াতেন তাহলে বোধহয় ভালো হতো। কিন্তু নোট ছড়াবার মতো উচ্চ ও উদার মন তাঁর ছিল না। তাঁর সঙ্গে-যে কয়েকজন মোসাহেব ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। মণিপুরি মেয়েরা বেশ প্রশস্ত স্থানে গান গাইছিল, সেজন্য সকলেই গান উপভোগ করতে পারছিল। চিৎকার করা, উচ্চ কথা বলা, মণিপুরিদের অভ্যাস ছিল না। তা ছাড়া, "পান নিয়ে আয়, তামাক নিয়ে আয়" এই ধরনের হাঁকডাকও ছিল না।

বেশিক্ষণ থাকতে ইচ্ছা হলো না, শৈলেন ও অন্য দুজন পর্যটককে রেখে চলে এলাম। এরা কোন্ সময়ে ফিরে এসেছিল জানি না, কিন্তু ঘুম থেকে একই সঙ্গে উঠেছিল।

ব্রিটিশ রেসিডেন্টের অফিসে যাওয়া হয়নি। সেখানে যেতে আদেশ বা অনুরোধ করা হয়েছিল। এর মধ্যে একজন বাঙালি যুবকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি মণিপুরি নৃত্য শিখতে ইমফল গিয়েছিলেন। পাঠান মুল্লুক দেখে এসেছেন এবং পাঠানদের গান শিখে এসেছেন বলছিলেন। আমি পাঠান মুল্লুকে ছয় বছর কাটিয়েছিলাম, সে-কথা তাঁকে বললাম না। উপযাচক হয়ে তিনি পাঠান নৃত্য দেখালেন এবং একটি গানও গাইলেন। গান গেয়েছিলেন 'তুরুক সুরে' সে-খবর তাঁর জানা ছিল না। তাঁর ভুল ধরতে ইচ্ছা হলো না, মেকি দেশে সবই মেকি চলছে। যে যে-রকমে পারো দু-পয়সা রোজগার করো, তাতে ক্ষতি কী?

পাঠানদের গানের সঙ্গে বাঙালি এবং গুজরাতি সুরের যত মিল আছে, শব্দের দিক দিয়ে আরো বেশি মিল রয়েছে। অসমিয়া ভাষার সঙ্গে গুজরাতির বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। 'শ' অক্ষরকে অসমিয়া, গুজরাতি এবং পাঠানরা 'হ' উচ্চারণ করে। এসব আমি জানতাম কিন্তু জানা বিষয় নিয়ে বাহাদুরি করা অভ্যাস ছিল না, সেজন্য যুবককে পুনরায় পাঠান গ্রামে যেতে বললাম না। পাঠান দেশের কথা যখন বলব তখন পাঠানদের সঙ্গে শব্দের, গানের সুরের সমতা কেন হলো, বলতে চেষ্টা করব।

রেসিডেন্ট-অফিসে কয়েকজন পুলিশ-অফিসারও ছিলেন, তাঁরা সবাই অসমিয়া। তাঁদের দুষ্টবুদ্ধি ছিল বলে মনে হচ্ছিল না। বড়ই সোজা প্রকৃতির লোক। তাঁরা-যে সরকারি তাঁবেদার এবং পেটের ভাতের জোগাড়ের জন্য চাকরি নিয়েছেন, সে-ধারণা বেশ জাগ্রত ছিল। অসমিয়াদের মধ্যে দারিদ্র্য ছিল না। তা হলে এঁরা চাকরি করতে এসেছিলেন কেন? অভাবের অনুভূতি হয়েছিল, কৃষ্টির মান উচ্চে উঠেছিল, সেজন্যই সরকারি চাকরি করতে এসেছিলেন।

অফিসের বাঙালি বাবুরা সেখানে শাসকরূপে গিয়েছিলেন। অনেকে নিজের বাসাবাড়িতে বসেই কাজ করতেন, যেন নিজের খাসমহল! অবশ্য সবার উপরে 'ব্রিটিশ সত্য' এ-কথা খুব ভালো করেই জানতেন এবং মিনিটে-মিনিটেই বোধহয় মনে রাখতে হতো 'সবার উপরে রেসিডেন্ট' এবং সেই রেসিডেন্ট ব্রিটেনেরই

স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতেন। এর পরেও বাবুদের ধমকাধমকি দেখলে মনে হতো যেন ভীমের পার্ট অভিনয় করছেন!

রেসিডেন্ট-অফিসে যতগুলি বাঙালি বাবু ছিলেন তাঁরা সকলেই টেররিস্টদের কথাই চিন্তা করতেন, কিন্তু একটিও টেররিস্ট দেখতে পেতেন না। মণিপুরের মতো স্থানে টেররিস্ট যাবে কেন? তবুও ভয়, কী জানি টেররিস্ট তাঁদের চাকরিবাকরি বুঝি খতম করে দেয়! এক অহেতুক কারণে সকলেই ভীত থাকতেন। আমাদের পেয়ে তাঁদের ভয় বেড়ে গিয়েছিল। অনেকের ধারণা হচ্ছিল, গুজরাতি ও বাঙালিতে এবার মিলন হলো। এই নিয়ে লম্বাচওড়া কেচ্ছা-যে তৈরি হচ্ছিল তাতে সন্দেহ ছিল না। এসব থেকে দূরে ছিলেন স্বয়ং রেসিডেন্ট সাহেব ও মণিপুরিরা। মণিপুরিরা ছিল মজুর এবং কৃষক, আর রেসিডেন্ট ছিলেন আর-এক মজুর। তিনি মধ্যবিত্ত নন, গ্রেট ব্রিটেনের কোথাও তাঁর নিজস্ব এক ইঞ্চি জমি ছিল না, কিন্তু মনে মনে বড়লোক। বাঙালি বাবুরা সবাই ছিলেন মধ্যবিত্ত এবং কৃষ্টিতে জগতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট। এদের মধ্যে টেররিস্ট-ভীতি থাকবে না তো কার থাকবে? আমার তখন কৃষ্টি-জ্ঞান হয়েছিল। অতীতের ইতি যাকে বড় গলায় ঐতিহ্য বলা হয় এবং ভবিষ্যতে যদি এই রকমেই আমাদের জীবন চলতে থাকে তাহলে আমাদের জাতি কালী-দুর্গার মতো 'ঐতিহ্য' নাম দিয়ে এক দেবীর পূজা করবে এতে আমার কোনো সংশয় নেই।

এখন রেসিডেন্ট-অফিসের কথা বলছি। বাবুদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মানুষে মানুষে দেখা হলে একে অন্যকে যেরূপ ভাবে আপ্যায়ন করে, রেসিডেন্ট সেরূপ ব্যবহারই করেছিলেন। তাঁর ব্যবহারে বেশ আনন্দই হয়েছিল। তাঁকে একসময়ে বললাম, "Why not build Tammu-Palel Road?" রেসিডেন্ট বললেন, "We don't need it." এর বেশি এ-সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। প্রকৃতপক্ষে আর কোনো কথাই হয়নি। রেসিডেন্ট হয়তো ভাবছিলেন, আমি বিদেশী। আমার আচার-ব্যবহার ওঁদের মতো ছিল না। তিনি শুধু বলেছিলেন, "Now you feel it." এর মানে, বিদেশ দেখা যেন অন্যায় হয়েছে। কাজেই কষ্ট পেতে হবে।

তখন মনের গতি ছিল অন্যরূপ। জীবনে অনেক রুশিয়ানের সঙ্গে থেকেছি, খেয়েছি এবং দেখেছি বিপ্লবী জীবন কাকে বলে। পলাতক রুশিয়ানদের কথা বলছি, মার্ক্সবাদী রুশিয়ানদের কথা বলছি না। মতবাদ বজায় রাখতে গিয়ে দেশত্যাগ করে পালিয়ে আসা বড় সহজ নয়। তারপর সারা জীবন বিপ্লব করে হঠাৎ ধপাস করে পড়ে যাওয়া, তা-ও কম নয়। এসব তো দেখেছি এবং যাদের পতন হয়েছে তাদের সঙ্গেও ছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, তাদের গলদ কোথায়। এরপরে আর পতনের কোনো কারণ ছিল না। মনে মনে আমি মধ্যবিত্ত, ক্রমে সেই মানসিক দুর্বলতাও চলে গিয়েছিল।

অনেকের ধারণা, গ্রেট ব্রিটেনে অথবা আমেরিকায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশ রয়েছে। ইংল্যান্ডের কোনো স্বনামখ্যাত লোক বলেছিলেন, "We have only one fool in every family." আমি সেই কথার প্রতিবাদ করে বলছি, বর্তমানে ইংল্যান্ডে প্রত্যেক হাজার পরিবারে একটি করে গোমূর্খ থাকে কি না সন্দেহ। অন্যদিকে আমাদের দেশে প্রত্যেক পরিবারে সম্পত্তির অধিকারী মাত্রই এক-একটি গোমূর্খ। ইংল্যান্ডের হাজার পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারও ভূমি-সম্পত্তি অথবা ব্যবসায়ী কোম্পানির শেয়ারের ডিভিডেন্ড বাবদ মাসিক অথবা বার্ষিক কিছু পায় কি না সন্দেহ। অতএব গোমূর্খের সংখ্যাও কম।

মণিপুরিদের মধ্যে মধ্যবিত্ত নেই বললেই চলে। সরলতা, কর্মক্ষমতা, মজুরের সম্মান — এসব প্রায়ই লক্ষ করতাম। একটি ব্রাহ্মণকে চাষের জমিতে চাষ-কাজে নিযুক্ত দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছিলাম। ক্ষত্রিয় নিজের জমি নিজে চাষ করে, অন্যান্যের কথা না-বললেও চলে। মণিপুরি স্ত্রীলোক মাত্রই স্বাধীন। অবতারবাদ তাদের মধ্যে হামলা করতে সক্ষম হয়নি। স্ত্রী-আচারের কাছে অবতারবাদ মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে অর্থাৎ হামলা করেও পরাজিত হয়েছে। মণিপুরি ভাষা সেজন্য প্রশংসার যোগ্য।

মণিপুরি ভাষা অসমিয়া তথা বাংলা অক্ষরে লিখিত হয়। আমাদের অক্ষরে মণিপুরি ভাষা লিখিত হয় দেখে খুশি হয়েছিলাম। এটা স্বাভাবিক এবং অজ্ঞানতার পরিচায়ক। আজ যে-জিনিসটাকে আমার অথবা আমাদের বলছি, একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায়, সেই জিনিসটা আমার অথবা আমাদের ছিল না। কোথাও থেকে কেউ এনেছিল অথবা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল। যে-বোঝা একদা বইতে কষ্টকর ছিল সেই বোঝা বইতে আজ আনন্দ হয়। মজার বিষয় তো! অজ্ঞানতার মোহ কম নয়!

মণিপুরিদের মধ্যে পূর্বে তালাক-প্রথা ছিল। তবে মুসলমানি তালাক-প্রথা ছিল না অথবা বর্তমানেও নেই। উভয় পক্ষই তালাকের দিক দিয়ে সমান অধিকার রাখত। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তালাক-প্রথাকে আরো উন্নত করেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মনিজ্‌ম তালাক-

প্রথাকে খর্ব করেছে। বর্তমানে বোধহয় তালাক-প্রথার উচ্ছেদ হয়েছে। ব্রাহ্মনিজ্‌মের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে চলছিল দেখেছিলাম, তারপর বর্তমানে কতকগুলি পৌরাণিক গল্পের সবাক চিত্রের মারফত ভারতের সর্বত্র 'মিথ' প্রচার হওয়ায় মণিপুর নিশ্চয়ই অধোগতির দিকে চলেছে। শুনেছিলাম, মণিপুরের মহারাজা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। এখন বাকি আছে চতুর্থ স্ত্রী গ্রহণ করা। অর্থাৎ দস্তুর মাফিক মহম্মদি ধর্মের তৃতীয় স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, বাকি রয়েছে চতুর্থ স্তরে ওঠা। চতুর্থ স্তরে উঠতে পারবেন বলে মনে হয় না। বর্তমানে মণিপুর একজন চিফ-কমিশনার দ্বারা শাসিত হয়। মণিপুরের রাজা শুধু নামেই রাজা আছেন, কাজে একজন খয়রাতভোগী মহামানব। মহামানব নিশ্চয়ই, নতুবা এমন খয়রাত ভোগ করবার অধিকার সকলের থাকে না।

ব্রিটিশ আমলের রাজা, মহারাজা, নবাব, সুলতান সকলেই মহামানব। প্রকৃতপক্ষে মণিপুর স্টেট ব্রিটিশরাই চালাত। তা-ও আবার অল্প খরচে। ব্রিটিশের অধিকৃত ভারতে তখন একজন কেরানির মাইনে কমপক্ষে ত্রিশ টাকা ছিল, অথচ একজন মণিপুরি ম্যানেজার অথবা কালেক্টরের মাইনে আট টাকার বেশি ছিল না। সেই মণিপুরি আইসিএস কী করে সংসারের খরচ চালাত, সকলেই জানতে চাইবেন। বাজারের তোলা থেকে পরিবারের উপযুক্ত খাদ্য পেত, বস্ত্র পেত, তারপর পেত আট টাকা। এর পরে অভাব থাকে কোথায়? হ্যাঁ, একটি অভাব সহজে পূরণ হতো না। মণিপুরিরা জীবনে একবার নবদ্বীপে না-এলে নির্বাণের অধিকারী হয় না। সেজন্য চুরি-চামারি, ডাকাতি করেও মণিপুরিরা নবদ্বীপে আসা-যাওয়ার খরচ জোগাড় করত। এখন করে কি না, অথবা নবদ্বীপে এসে 'হাজি' হবার প্রবৃত্তি আছে কি না জানি না। না-থাকার সম্ভাবনা বেশি, কারণ এটা ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের শুধু অন্তর্গত নয়, সমস্ত মণিপুর জেলাটাই জাপানিরা দখল করেছিল। জাপানি আক্রমণে সাধারণ লোকের মানসিক উন্নতি হয়েছিল বলতে হবেই। ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে অন্তত আর্টিফিশিয়াল ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে, বই পড়বার অধিকার আছে। ঢাকাতে তা-ও নেই। এইচ.জি.ওয়েল্‌স-এর 'পৃথিবীর ইতিহাস' ঢাকার লোক পড়তে পারে না।

৩

ইমফল ছোট্ট শহর, দেখার মতো কিছু ছিল না, কিন্তু অনুভব করার মতো অনেক কিছু ছিল। অনেকে এখানে এসে মস্ত বড় বড় বই লিখে ফেলেন, আমার পক্ষে বই লেখা সম্ভবপর হবে না, কারণ সেরূপ জ্ঞানচক্ষু আমার নেই। মণিপুরি জাতিকে ভালো করে চিনবার মতো সময়ও ছিল না। আমার সামনে মস্ত দুনিয়া, মণিপুরে বসে থাকলে চলবে কেন?

সঙ্গের দুজন গুজরাতি তৃতীয় দিন সকালবেলা মণিপুর পরিত্যাগ করলেন। আমরা দুজন রইলাম। দেশী ভাইদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেতেছিলাম। খেতে বসবার পূর্বেই চিন দেশের খাদ্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে হতো। বাবুরা ভাবতেন, তাঁরা যা খান তা-ই হলো সবচেয়ে উত্তম খাদ্য, অন্যান্য জাতির লোক কুখাদ্য খায়। তাঁরা মণিপুরি খাদ্যের প্রতিও কটাক্ষ করতে ছাড়তেন না। এঁদের কথা শুনে মনে মনে হাসতাম কিন্তু কিছু বলতাম না। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এখনও মলমূত্র পরিষ্কার করতেও জানেন না, আচার-ব্যবহারে অনেক পেছনে রয়েছেন, তা বুঝিয়ে বলতে লজ্জা করত। নিজের দোষ কেউ স্বীকার করতে চায় না, বিশেষ করে আমাদের দেশের লোক।

মণিপুরি ছাত্রেরা আমার অন্বেষণে ছিল কিন্তু আমি বেশিরভাগ সময়ে থাকতাম সাহেব-পাড়ায় অর্থাৎ বাঙালি অফিশিয়াল কোয়ার্টারে, সেজন্য তাদের সঙ্গে দেখা হতো না। বোধহয় চতুর্থ দিন এক মণিপুরি স্কুল-মাষ্টার আমাকে পথে ধরে বললেন, "চলুন আমাদের স্কুলে, সেখানে চিনের অভিজ্ঞতা বলতে হবে।" হ্যাঁ-কি না করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, অবশেষে শৈলেন বলল, "চলুন।"

আমি ভাবছিলাম, মণিপুরিরা প্রথমত মংগোল জাতির লোক, দ্বিতীয়ত এদের মধ্যে মধ্যবিত্ত মোটেই নেই। আমার লেকচার শুনে যদি বিদ্রোহ করে তাহলে সামলাতে পারব না, উপরন্তু এরা গাঁজার গল্প মোটেই উপভোগ করতে পারে না। 'যা দেখেছ তা-ই বলে যাও' এটাই হলো তাদের শ্রোতব্য বিষয়।

বিদ্যালয়ে গেলাম এবং দেখলাম, যেসব ছাত্র বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করে তারা সকলেই মজুরদের ছেলে। এদের কাছে যদি চিনের কথা বলি তাহলে এরা বিগড়াবে। অপরকে বিগড়ানো অতি সহজ কিন্তু ঠিক পথে চালানো বড়ই কঠিন। স্কুল-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে সামান্য দু-চার কথা বলতে বাধ্য হলাম। সংক্ষেপে জানিয়ে দিলাম — ঘুমন্ত চিন জেগেছে, মাও-সে-তুং এবং চু-তে চিন জাতিকে মুক্ত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

টিকেন্দ্রজিৎ ব্রিটিশের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন, ছাত্রেরা বোধহয় মনে করেছিল মাও-সে-তুং এবং চু-তে টিকেন্দ্রজিতের মতোই কেউ হবেন। মণিপুরি ছাত্রদের মধ্যে জাতীয় ভাব ছিল। বিদ্যাভ্যাসের ফলে দেশপ্রেম বেড়েছিল এবং সেইসঙ্গে বাঙালি-বিদ্বেষও জেগেছিল। রেসিডেন্টের পরেই তারা দেখতে পেত বাঙালি বাবুরা তাদের প্রতি রক্তচক্ষু বিস্তার করে আছেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ হওয়া স্বাভাবিক। বাঙালি ক্লাব, বাঙালিদের দুর্গাপূজা মণিপুরিরা দূর থেকে দেখত এবং পাঁঠা কাটা দেখে বাঙালি হিন্দুদের ম্লেচ্ছ বলে প্রতিশোধ নিত। বাঙালি আমরা, দূরদর্শী ছিলাম না কোনো কালেই। যদি আমাদের দূরদর্শিতা থাকত তাহলে কালীপূজা এবং দুর্গাপূজায় অন্তত মণিপুরে পাঁঠা কাটতাম না।

বাবুরা বিএ এবং বিএসসি পাশ করেও চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণের সময়ে বর্বরদের মতো মরণভয়ে ভীত হয়ে চিৎকার করতে আরম্ভ করতেন। মণিপুরিদের মধ্যে সেই প্রথা নেই এবং ছিল না। একবার মণিপুরিরা সূর্যগ্রহণের সময়ে বাঙালি সংকীর্তনের পার্টিকে আক্রমণ করেছিল। মণিপুরিরা সূর্যগ্রহণ দেখে আনন্দিত হয়, মাটি অথবা পাথরের মধ্যে জল রেখে বার বার দেখে, সেই সময়ে বাঙালিদের 'হরিবোল' চিৎকার পছন্দ করে না এবং সেজন্যই আক্রমণ করেছিল। রেসিডেন্ট সাহেব পাঞ্জাবি সৈন্য এনে মণিপুরিদের শাস্তি দিয়েছিলেন। কারো ধর্মে হাত না-দেওয়া যাদের প্রিন্সিপ্‌ল তারা কী করে বাঙালি বাবুদের সাহায্য না-করে থাকতে পারে?

মণিপুরি স্ত্রীলোক বড়ই কর্মঠ। কাপড় বোনা, রান্না করা, শাকসবজি ফলানো, শিশুরক্ষা, কাপড় কাচা — এর পরে দরকার বোধে জমিতে চাষ দেওয়ার কাজেও আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। মণিপুরি শিশুরা প্রায়ই বেশ স্বাস্থ্যশালী। তারা-যে বেশি কিছু খায় তেমন নয়। মায়ের দুধও তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মণিপুরি, অসমিয়া এবং অন্যান্য মংগোল জাতির মধ্যে কলার অত্যধিক প্রচলন আছে। তা বলে সকল রকমের কলা শিশুদের খেতে দেওয়া হয় না। এঁঠেল কলা (যাতে অত্যধিক বিচি থাকে) থেকে চালুনির সাহায্যে বিচি বের করে নিয়ে লবণ এবং পারলে সামান্য দই মিশিয়ে খেতে দেওয়া হয়। শিশুরা একটু বড় হলেই চিঁড়ে খেতে আরম্ভ করে। মুড়ি ও খইয়ের চেয়ে চিঁড়ে পুষ্টিকর। এতেই মণিপুরের যুবক-যুবতীর শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এরূপভাবে এঁঠেল কলা খাওয়া লুসাই, গারো, নাগা, খাসি এবং অন্যান্য পার্বত্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। অথচ এমন উপাদেয় খাদ্য বাঙালিরা ব্যবহার করে না। তার একমাত্র কারণ হলো অসমবাসীরাও তাদের শিশু এবং কিশোরদের এঁঠেল কলা খেতে দেয়। বাঙালিবাবুরা অসমিয়াদের 'ভূত' বলতে বড়ই পছন্দ করেন। কী জানি এঁঠেল কলা খেয়ে যদি তাদের মতো ভূত হতে হয়, সেই ভয়েই আমাদের জাতি এত ভালো জিনিসও পরিত্যাগ করেছেন।

মণিপুরিদের বিয়ে আমাদের মতো হয় না। আমাদের বিয়ের প্রথা অবিকল আরবি প্রথায় হয়ে থাকে। মণিপুরিরা যেমন মেয়ে দেখতে যায়, তেমনই মেয়েরাও ছেলে দেখতে যায়। অবশ্য এই নিয়মটি আধুনিক। পূর্বে সেরূপ ছিল না। মেয়েরাই স্বামী বেছে নিত এবং এখনও মেয়েরাই স্বামী বেছে নেয়। স্বামী বেছে নেওয়া এবং পাঁঠা কেনা একই। ছেলের ক-টা দাঁত উঠেছে তা যুবতী হাত দিয়ে দেখে। দাঁতে ক্ষয় আছে কি না তা-ও দেখাতে হয়। শরীর কেমন দেখাতে হয়, উপরন্তু শক্তি এবং সাহসের পরিচয় দিতে হয়। মেয়ের দিকে কোনো রকমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় না।

অসমিয়া এবং মণিপুরিদের মধ্যে এখনও এমন অনেক শ্রেণির লোক আছে যাদের মেয়েদের বিয়ে হয়নি অথচ চার-পাঁচটি সন্তানের মা হয়েছেন। বিয়ে করাটা তত বড় কাজ নয়, স্বামী-স্ত্রীতে মিলে-মিশে থাকাই বড় কাজ। অনেক মায়ের বিয়ে হয় ছেলের উপনয়নের পূর্বে। আমরা যাকে দ্বিজত্ব বলি, এটা উত্তরের লোকের সৃষ্ট নয়, এটা মংগোল জাতের সৃষ্ট। উত্তরের লোক দ্বিজত্বপদ্ধতি গ্রহণ করেছে মংগোলদের কাছ থেকে। উপনয়ন মানে পুরুষতার পূর্ণ অনুভূতি এবং কৃষ্টির মধ্যে এনে উচ্ছৃঙ্খলতা অপসারণ করা। উত্তরের লোকের মধ্যে অর্থাৎ তথাকথিত আর্যদের মধ্যে যখন বিবাহপ্রথা ছিল না, তখন যে-কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে যে-কেউ বসবাস করতে পারত। আর্যদের মধ্য থেকে এই বর্বরপ্রথা লোপ পাবার পূর্ব থেকেই বোধহয় মংগোল, ব্রাউন মংগোল, টিবেটো-বর্মনদের মধ্যে দ্বিজত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে দ্বিজত্ব প্রচলিত ছিল না। সেজন্য স্ত্রীলোকেরাই শুধু পূর্বকালে ব্যভিচারী হতেন, পুরুষেরা সংযত থাকতেন। এই নিয়ম পৃথিবীতে যত আদিবাসী আছে সকলের মধ্যেই এখনও প্রচলিত আছে। আর্য এবং সেমেটিকদের মধ্যে দ্বিজ হওয়ার প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল না, রামায়ণ কাব্যে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

দ্বিজ হওয়ার সময় তখনই হয় যখন পুরুষের শরীরে যৌবন

দেখা দেয়। যখন যৌবন বিকশিত হতে থাকে এবং শরীর বৃদ্ধি পায়, সেই বৃদ্ধি যাতে ব্যাহত হতে না-পারে সেজন্য আদিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হতো। যেমন নিজের ভাত নিজেই রান্না করা, পরিশ্রমের কাজ করা, দিনে না-ঘুমনো, মাথার চুল কেটে ফেলা, নারী-সংস্পর্শ একেবারে পরিত্যাগ করা, রাতে কিছু না-খাওয়া ইত্যাদি। এই ধরনের রীতি মণিপুরিদের মধ্যে, যারা জঙ্গলের বাসিন্দা তাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। শহরের লোকের আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ পৃথক। এখন বলতে ১৯৩২ খ্রি. বুঝতে হবে। আজকের অবস্থা কিছুই জানি না।

মণিপুরিদের মধ্যে যাঁরা সন্তানের মা তাঁরা তাঁদের শিশুদের ভালোমন্দ যেমন বুঝতে পারেন, পুরুষেরা সেরূপ বুঝতে রাজি নয়। রোগগ্রস্ত শিশুর কাছে না-যাওয়া, দূর থেকে শিশু কেমন আছে জিজ্ঞাসা করা এবং যদি শিশু মারা যায় তাহলে সৎকার করা, এর বেশি পুরুষদের যেন কিছুই করবার নেই! এই ব্যবহার পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

ভূত, প্রেত, দেবতা, অপদেবতা, ঈশ্বর এসবকে ভয় করাই মণিপুরিদের অভ্যাস। সন্ধ্যার পরে গন্ধক, শস্য ও শস্যের তেল আগুনে দেবার প্রচলন রয়েছে। শিশু জন্ম নেবার পর তার পাশে বাঘের চামড়া, লোহা, ঝাঁটা এবং আরো অনেক কিছু রেখে দেওয়া হয় যাতে অপদেবতা আশ্রয় করতে না-পারে। জ্বর হলে যদি কারো 'ডিলিরিয়াম' হয় এবং আবোলতাবোল বকে, তাহলে তাকে অপদেবতায় পেয়েছে মনে করা হয়। অপদেবতা-পাওয়া দুটি জ্বরের রোগীকে মাথা ধুইয়ে দেবার পর ভূত অথবা অপদেবতা থেকে আমি মুক্ত করেছিলাম।

ভূত, প্রেত, অপদেবতা শুধু মণিপুরের শিক্ষিত-সমাজে অবস্থান করে না, ভারতের প্রত্যেক বাড়িতে এসবের অভাব নেই। যেসব গল্প শোনা যায়, অনেক সময়ে বুদ্ধি খাটিয়েও কোনো মীমাংসায় আসা যায় না এরূপই অনেকের ধারণা। কিন্তু অনেক গল্পের সমাধান ছয় মাস পরে হয়েছে এবং ভূত-যে অশিক্ষিত ভূতের ঘাড়েই চাপে তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। ভারত-ভ্রমণে ভূতের প্রাচুর্য থাকবেই, নতুবা ভারত-ভ্রমণের মর্যাদা কী করে থাকে? মণিপুরিরা ভূতের ভয় থেকে রেহাই পায়নি, কিন্তু কোথা থেকে এবং কী করে মণিপুরিদের মধ্যে ভূত প্রবেশ করেছিল তা-ই ছিল অন্বেষণের বিষয়। শ্যাওড়া, কদম্ব, বট, তেঁতুল এবং অন্যান্য উচ্চ বৃক্ষেই ভূতপ্রেতের বাসস্থান। আলেয়ার জন্মস্থান পচা ডোবা, খাল-বিল। মণিপুরে এসব আছে বটে কিন্তু আলেয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। শীতের আধিক্য এবং প্রবল বাত্যা থাকার জন্য গ্যাস হতে পারে না। তবুও বনাঞ্চলে বড় বড় গাছের পচা অংশে আলোয়ার সৃষ্টি হয় এবং সেই আলেয়া প্রখর না-হওয়ায় ভয়ের কারণ হতে পারে না।

মণিপুর, অসম, উত্তর বিহার, বঙ্গদেশ সর্বত্রই ভূতের ভয় বেশি এবং সেই ভয় শিক্ষিত-সমাজে সীমাবদ্ধ। মণিপুরিদের মধ্যে যারা বৈষ্ণব অথবা মুসলমান নয় তারা ভূতকে ভয়ও করে না এবং ভূত স্বীকারও করে না। কিন্তু বাঘ, অতিকায় সাপ, অতিবৃদ্ধ শূকর, হাতি এবং আচমকা দেখা বন্যজীবকে ভূতের মতোই ভয় করে এবং হত্যা করারও চেষ্টা করে। এসব জীব যাতে তাদের অনিষ্ট না-করে সেজন্য মোরগের রক্ত, ডিম, কলা এবং আতপ চাল কোনো গাছের নীচে রেখে আসে। মণিপুরিদের কাছ থেকেই এসব কথা শুনেছিলাম, এখন বোধহয় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জাপানি আক্রমণে শুধু ভূতই পালায়নি, অনেক জানোয়ারও পালিয়েছে।

আমাদের বিদায়ের সময় হয়ে এসেছিল। আবার রেসিডেন্ট-অফিসে যেতে হলো। বড়বাবু অনেক বড় বড় কথা বলে অসমিয়া ইনস্পেক্টরকে কী আদেশ দিলেন। আমরা চলে এলাম। আমাদের গন্তব্য স্থান মাও।

আমরা দু-একদিনের মধ্যে রওনা হব জেনে একজন বাঙালি পণ্ডিত জানাতে এলেন যে কোন্ দিন রওনা হলে বিপদ হবে না। পণ্ডিত অমায়িক এবং দয়ালু। কোনোরূপ দুষ্ট বুদ্ধি তাঁর ছিল না। ভদ্রলোক অসমের বাঙালি, অসমিয়াদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। পণ্ডিত মহাশয় অনেক রকমের হিসাব করার পর একটি দিন ধার্য করলেন। মনে মনে হাসলাম এবং বললাম, "আপনার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, তবে এসব রাশি এবং তথাকথিত নক্ষত্র আমি মানি না। আমাদের এখান থেকে সত্বরই চলে যেতে হবে।" পণ্ডিত দুঃখিত হলেন এবং বললেন, "এতগুলি দেশ ভ্রমণ করার পর এসবে অবজ্ঞা, এ তো কম কথা নয়!"

পণ্ডিত জানতেন না যে জ্যোতিষ-বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ এবং বিজ্ঞানসম্মত নয়। ইন্ডিয়া থেকে আরবগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করে জ্যোতিষ শাস্ত্র হাতে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। সেই পরিত্যক্ত শাসন-পদ্ধতি (বিজ্ঞান নয়) ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচারকদের আর্থিক উন্নতির অনেক সুযোগ করে দিয়েছিল।

কতকগুলি গ্রহ-নক্ষত্র মন ও শরীরের উপর কাজ করে, এই কাল্পনিক মত সমর্থন করে কতকগুলি মিথ্যা গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। এসব জানতাম, সেজন্য পণ্ডিতের প্রতি দয়া হয়নি।

আমার জন্ম এমনই এক পরিবারে হয়েছিল যে-পরিবারে আস্তিক এবং নাস্তিকের সমাবেশ ছিল। সাংখ্য অনেকটা নাস্তিকত্ব সমর্থন করে। বেদান্ত দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদ নিয়ে মাথা ঘামায়, তা ছাড়া ন্যায়-অন্যায়েরও সমর্থন করে — এসব কথা ছোটবেলা থেকে নিজের বাড়িতেই শুনতাম। এর পরে পশ্চিমা দর্শনগুলিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন আমার পরিবারের অনেকেই। আমি হলাম পণ্ডিত-পরিবারের মূর্খ ছেলে, আমাকে শনিবারের বারবেলা এবং মঘা নক্ষত্র ভয় দেখাবে কী করে? আমরা দিনক্ষণ না-দেখে ইচ্ছামতো একদিন মণিপুর থেকে রওনা হয়েছিলাম।

ইমফল থেকে কোহিমা মাত্র পঁয়তাল্লিশ মাইল। এই পথটুকু চলা একদিনেই সম্ভবপর। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় একটি শব্দ আছে, যাকে বলা হয় 'টোপোগ্রাফি'। আমার কাছে যে-মানচিত্র ছিল তাতে মাও নামক স্থানের কথা লেখাই ছিল না। ভারতীয় সার্ভে-বিভাগ পূর্বেও অপদার্থ ছিল, বর্তমানেও বিশেষ উন্নতি করেছে বলে মনে হয় না। চিত্রাঙ্কনে-যে পারদর্শী লোকের দরকার, ভারতীয় সার্ভে-বিভাগ এখনও তা বুঝতে পারেনি। হ্যাঁ বুঝবে, যেদিন উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবগুলি কর্মচারীকে এক ঘণ্টার নোটিশে বরখাস্ত করা হবে। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, এমন-কি সেদিনের মুক্ত মহাচিনের কাছে ভারতবাসী নিতান্ত শিশু বললেও দোষ হয় না।

মাও গ্রামে পৌঁছতেই আমাদের বারোটা বেজে গেল। সেখানে থাকবার ব্যবস্থা ছিল না। সামান্য জলযোগ করে আরো বারো মাইল নীচে গিয়ে একটি ডাকবাংলো পেয়ে সেখানেই বিশ্রাম করব ভাবলাম। দ্বিপ্রহর এবং রাত্রের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিল ডাকবাংলোর দ্বারোয়ান। বিকেলে পাশের গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেকটা ট্রপিক্যাল দেশের মতো। আম, জাম, সুপারি, কাঁঠাল বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে ছিল। একজন গ্রামের লোক বলল, আগের দিন ডাকবাংলো থেকে একটি ঘোড়া বাঘে নিয়ে গেছে। গ্রামের হেডম্যান বাঘটাকে গুলি করেছিল, গুলি লাগেনি বলেই মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যার পূর্বেই ডাকবাংলোয় ফিরে এসেছিলাম। দ্বারোয়ান ফটক বন্ধ করে দিয়ে ডাকবাংলোর সব দরজা বন্ধ করে দিল। রান্না সন্ধ্যার পূর্বেই করেছিল। আমরা ক্ষুধার্ত না-থাকা সত্ত্বেও খেতে বাধ্য হয়েছিলাম। অবশেষে দ্বারোয়ান বাতি নিবিয়ে দিয়ে গল্প বলতে আরম্ভ করল। বাঘের ভয়ে দ্বারোয়ান আধমরা হয়ে ছিল। আমাদের পেয়ে সে খুশিই হল।

পরদিন আমরা কোহিমা পৌঁছই। কোহিমা নাগা পাহাড়ের জেলা-কেন্দ্র, ডেপুটি কমিশনার থাকেন এখানে। এখন থাকেন কি না জানি না। আমরা এক স্বজাতি ভাইয়ের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। কোহিমা থেকে মণিপুর রোড পর্যন্ত পথ বেশ চালু থাকায় একদিনেই মণিপুর রোডে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম।

ডিমাপুর থেকে সদিয়া

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী যদি কেউ কিছু করতে চায় এবং তারই সঙ্গে যদি এমন কেউ থাকে যার পরিকল্পনায় সময়ের নির্দেশ না-থাকে, তাহলে বড়ই বিপদে পড়তে হয়। আমার সাথি শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ দে-র পূর্বপরিকল্পনা ছিল। তার পরিকল্পনা ছিল মার্চ মাসে দার্জিলিং পৌঁছনো। আমার পরিকল্পনায় সময়ের নির্দেশ ছিল না। সদিয়া এবং তারও উত্তরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল, আমি সদিয়া যেতে মনস্থ করেছিলাম।

রেল স্টেশনের নাম মণিপুর রোড এবং গ্রামের নাম ডিমাপুর। রেল স্টেশনে পৌঁছে ডিমাপুর গ্রামটা দেখতে গেলাম। শৈলেন গেল না। কেন গেল না অথবা কেন যাবে না সে-প্রশ্ন করার অধিকার আমার ছিল না। গ্রাম দেখতে যাবার সময় বলে গেলাম, "আজ এখানেই থাকতে হবে এবং আমরা থাকব ওয়েটিং রুমে। তুমি সেখানে যাও, স্নান করো, তারপর রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিয়ো।"

আমার কথার কোনো জবাব না-পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলাম। ভাবলাম, হয়তো ভারতীয় আবহাওয়া শৈলেনের মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

মণিপুর রোডের পাশেই যে-গ্রাম সেই গ্রামের এক পাশে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেকক্ষণ উপভোগ করলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করে লাভ হবে না, যাঁরা দেখতে চান তাঁরা দেখে আসবেন। তারপরই দেখতে পেলাম একদল কুকি চলে যাচ্ছে। তাদের শরীরের গঠন, চলার ভঙ্গি, বাক্যের উচ্চারণ ভালো করে লক্ষ করলাম, তারপর এই নিয়ে কত কী চিন্তা! বাস্তবিকই এসব চিন্তা মনে আসত বলেই পৃথিবী-ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

কতক্ষণ বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখি, শৈলেন সদিয়ার টিকিট কিনে ফেলেছে। চারখানা টিকিট। আমাদের দুজনের দুখানা। তা ছাড়া দুখানা সাইকেলের ভাড়া দিয়ে এসেছে। চারজন যাত্রীর পক্ষে সাইখোয়া ঘাট পর্যন্ত পৌঁছতে যা ভাড়া, আমাদের সাইকেল সমেত সেই ভাড়া। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে সাইখোয়া ঘাট, সেই পর্যন্তই রেলগাড়ি যায়।

শৈলেনের কাছে টাকা ছিল না তাই আমি জানতাম, কিন্তু হঠাৎ এত টাকা কোথা থেকে পেল ভেবে পাচ্ছিলাম না। জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করছিল। শৈলেন শ্রেণির যুবক ভিন্ন প্রকৃতির। প্রকৃত বিপ্লবী যারা হয় তারা জীবনটাকে তুচ্ছ মনে করে আজীবন। এরা একগোছের জীব বটে। এদের জীবন আছে। খায়, ঘুমোয় সবই করে কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে জীবনটা শেষও করতে পারে। আমার ধারণা ছিল না যে শৈলেন টেররিস্ট। কিন্তু তার দার্জিলিঙের কার্যকলাপ ও পরে ভাওয়ালের কার্যকলাপ দেখে ভালো করে বুঝতে পেরেছিলাম, সে টেররিস্ট ছাড়া আর কিছু ছিল না। কোথায় লাগে দাদা আর ফাদা, যাকে হত্যা করবে ঠিক করে নিল তাকে হত্যা করবেই। শত গোর্খায় বেষ্টিত হয়ে থাকলেও জীবন রক্ষা পাবার উপায় নেই। মারলে যে কষ্ট অনুভব করে না, যার মাংস কাটলেও সে হু-হা করে না, সর্বদাই হাসিমুখ, তার প্রতি কে কত অত্যাচার করতে পারে? ভ্রমণ-জীবন শেষ হবার পর কলকাতায় ফিরে এসে ১৯৪১ সালে শৈলেনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলেছিল, সিকিউরিটি কয়েদি হিসেবে রেঙ্গুনের ইনসিন জেলে সাত বছর সে আবদ্ধ ছিল। তাতেও তার মনে কিছুমাত্র দুর্বলতা আসেনি। সে তার জেলজীবনের কতকটা আভাস দিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম, বন্দিদের মধ্যে সকলেই বিপ্লবী ছিলেন না।

বোধহয় রাত ন-টার সময় মণিপুর রোড থেকে আমরা রেলগাড়িতে উঠেছিলাম। বেশ পরিশ্রান্ত ছিলাম। গাড়িতে শোবার স্থান মিলেছিল। তারপর যখন ঘুম থেকে উঠেছিলাম, তখনও আমরা পার্বত্য ভূমির উপর দিয়ে চলছিলাম। সেই পথচলা আরামদায়ক বটে। দু-দিকে দিগন্তব্যাপী পর্বতমালা, লোকের বসতি আছে বলে মনে হচ্ছিল না। বিকেলের দিকে ধীরে ধীরে গাড়ি সমতল ভূমিতে চলতে আরম্ভ করল। বুঝলাম, আমরা সাইখোয়া ঘাটের কাছে এসেছি। বিকেল চারটের সময় আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। গাড়ি থেকে নেমেই সদিয়ার ফেরিবোটের দিকে রওনা হলাম।

আমরা ইচ্ছা, সাইদুল্লার মুসলিম লিগ রাজত্বের পত্তন দেখা। পত্তন আরম্ভ হয়েছিল নদীর উত্তর তীরে। আমরা নদী পার হলাম। তারপরই দেখা হলো একদল অসমিয়ার সঙ্গে। তারাও সাইকেলেই আমাদের পেছন নিয়েছিল। কাউকে কিছু না-বলে আমরা একটি মাড়োয়ারি ধরমশালায় উঠলাম। ধরমশালাটা মস্ত বড় কিন্তু অপরিষ্কার। তাতেও আমরা ভ্রুক্ষেপ করলাম না। আমার উদ্দেশ্য, শৈলেনকে ব্রিটিশ সরকারের কুমতলব বুঝিয়ে দেওয়া।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ধরমশালার এক কোণে কম্বল পেতে বসলাম। ধরমশালার মালিক আমাদের একটা ডিজ্ ল্যাম্প দিয়ে গেল।

তাই আমাদের দেখার পক্ষে প্রচুর। একটুও বিশ্রাম না-করে মানচিত্র খুলে শৈলেনকে দেখালাম, "ওই দেখো, চিনের চেকিয়াং প্রদেশ। এই প্রদেশটা তিব্বতের একটি অংশ। এখানকার অধিবাসী প্রায় সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী। আর ওই দেখো সদিয়া ফ্রন্টিয়ার জেলা। এই জেলা দরং, নাগা হিল এবং কামরূপের কতকটা নিয়ে ব্রিটিশ রাজ্য গঠনের মতলব করেছে। যদিও এই রাজ্যকে মুসলিম স্টেট নাম দেওয়া হবে, হয়তো সাইদুল্লা এই স্টেটের প্রধানমন্ত্রীও হতে পারেন, কিন্তু দেশটা হবে ব্রিটিশের অধীনে। এটা যদি ফলবতী হয় তাহলে চিন ও ভারতের ঘাড়ে বসে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদী পা দুলোবে এবং উভয় দেশের প্রতি খবরদারি করতে পারবে।

বিষয়টা বুঝতে পারা মাত্র শৈলেন জিজ্ঞাসা করল, "সাইদুল্লা থাকে কোথায়?"

"এসব বাজে কথা শৈলেন, একটা কি দুটো লোক হত্যা করলে ব্রিটিশ পরিকল্পনা ধ্বংস হবে না। যদি পারো তো সর্বসাধারণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করো, মাও-সে-তুঙের মতো তোমরাই সদিয়া দখল করে নাও, দেখবে ব্রিটিশ পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেছে।"

আমরা যখন এই প্রকারের কথায় লিপ্ত ছিলাম, তখন দুজন অসমিয়া ভদ্রলোক তাঁদের মেসে গিয়ে থাকতে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। আমরা সাদরে তাঁদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

যে-রুমটাতে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল, পাশের রুমের একজন অসমিয়া আমাদের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "মনে করবেন না এটা আপনাদের বন্ধুগৃহ, এটা সত্যিকারের পুলিশ-মেস, অতএব কারো কাছে কিছু বলবেন না।" আমার ভয়ের কোনো কারণ ছিল না, যত ভয় শৈলেনকে নিয়ে।

নিরাপদে রাত্রি কাটিয়ে আমরা যখন পরশুরাম কুণ্ডের দিকে চলেছি তখন পুলিশ আমাদের বাধা দিল এবং জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেল।

ম্যাজিস্ট্রেট অফিসেই ছিলেন। আমাদের বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এদিকে কী দেখলেন?"

"এরই মধ্যে অনেক কিছু দেখেছি। এত বড় বিস্তৃত সমতল ভূমি অনাবাদি পড়ে আছে। লক্ষ লক্ষ লোক এখানে বাস করতে পারে। জমি সমতল এবং পরিষ্কার। এত পতিত জমি থাকতে আমাদের দেশের লোক জমির অভাব বোধ করছে, তাই দেখে এলাম। পথের দু-পাশে পাঞ্জাবিরা গ্রাম করেছে বটে কিন্তু এখানে এরা থাকতে পারবে না। আমাদের দেশের বাঙালিরা যদি এখানে থাকবার সুবিধা পায় তাহলেই ভালো হবে।"

ম্যাজিস্ট্রেট বাধা দিয়ে বললেন, "অনেক বাঙালি-গ্রাম এদিকে আছে, দেখেছেন কি?"

"নিশ্চয়, এদের অবস্থা দেখলে সকলের চোখেই জল আসবে।"

"এরা সবাই মুসলমান বাঙালি।"

অবতারবাদ এত নীচ স্তরে নেমে এসেছিল সে-কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম না। একদা অবতারবাদের প্রভাবে মুসলমানদের মানুষ বলেই স্বীকার করতাম না, কিন্তু যেদিন স্টালিন-সোভিয়েত দেখেছিলাম, সেদিন থেকে অবতারবাদ আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

বাঙালি মুসলমান শিশুদের রোদে বৃষ্টিতে খেলা করতে দেখেছিলাম। তারা ছিল অরক্ষিত। তাদের মা-বাবা পেটের অন্ন জোগাড় করবার জন্য, অনেক দূরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করছিল। তারা জানত না, দুষ্ট লোক ময়মনসিংহ জেলা থেকে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের নিয়ে এসেছিল দূর দেশান্তরে। তবুও ভালো, তারা পরিশ্রম করছিল। তাদের আচার-ব্যবহারে ইসলাম সভ্যতার গন্ধও ছিল না। তবে তারা জানত, তারা মুসলমান, এর বেশি নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চাইছিলেন মুসলমান বাঙালিদের সম্বন্ধে কিছু বলি। কিন্তু আমি সাম্প্রদায়িকতাকে একটুও প্রশ্রয় দিলাম না। তখন আমি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে, অবতারবাদের ঊর্ধ্বে, কাস্টইজ্‌মের ঊর্ধ্বে। অথচ শিশুর ক্রন্দন আমাকে কাঁপিয়ে তুলত, বৃদ্ধের আর্তনাদ আমার মনে বিদ্রোহের ভাব এনে দিত, স্ত্রীলোকের প্রতি অপমান সহ্য করতে পারতাম না। আমি হয়ে গিয়েছিলাম কাকের বাসার কোকিলের ছানা। সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি না দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আদেশ করলেন, আজই সন্ধ্যার পূর্বে যেন সদিয়া শহর পরিত্যাগ করে যাই।

ম্যাজিস্ট্রেট একজন অসমিয়া মুসলমান। কিন্তু আমার কাছ থেকে সাম্প্রদায়িকতা-সম্পন্ন কথা কী করে পেতে পারেন? কী করে আমি বাঙালি মুসলমানদের ঘৃণা করতে পারি? ময়মনসিংহের মুসলমানদের শরীরে দ্রাবিড়-রক্তের প্রাচুর্য ছিল। হাজর উপজাতি পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার বাসিন্দা ছিল। কালের প্রভাবে তারা ব্রাহ্মণদের কাছে অনার্য নামে পরিচিত হয়। বুদ্ধযুগে তারা মুক্ত হয়েছিল, পৃথিবীর অনেক দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করেছিল। আবার যখন শংকরাচার্য ব্রাহ্মণ্য-প্রথা প্রচলন করেছিলেন, পুনরায় তারা অনার্য হয়েছিল। তারপর এল পাঠান এবং মোগল। সে-যুগেও তারা শুধু গোলাম আর বাঁদি হবার অধিকারী হয়েছিল। ব্রিটিশ-আমলে তারা হয়েছিল মুসলমান। এত ঘাত-প্রতিঘাত যাদের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে তাদের প্রতি কোন্ পাষণ্ড দয়া না-দেখাতে পারে?

শৈলেন কী চিন্তা করছিল। বোধহয় তার মনে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ আরো উগ্র হয়েছিল। দ্বিপ্রহরে একটি অসমিয়া ভাতের দোকানে স্নানাহার সমাপ্ত করে একটু বিশ্রাম করলাম, তারপর নদীতীরে এসে শৈলেনকে বললাম, "কী বুঝলে শৈলেন? এই তো আমার দেশ! তোমার শরীরে যে-রক্ত বইছে সেই রক্ত ময়মনসিংহের মুসলমানদের শরীরেও বইছে। এদের জন্য কি তোমার একটুও দয়া হয় না?"

"সব হারিয়ে ফেলেছি, মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তার কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে এটা বুঝেছি, এদের শরীরের রং, চেহারা এবং ভাষার সঙ্গে নিকট-সম্বন্ধ রয়েছে। কথা হলো, প্রথমে স্বাধীন হতে হবে, তারপর এদের কথা চিন্তা করব।"

"তা হয় না শৈলেন। সান-ইয়াৎ-সেন মাঞ্চু-বংশকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন কিন্তু চিয়াং কাইশেক তাঁর স্বজাতিকে লুটেই যাচ্ছেন, উপকার তো করতে পারছেন না। এসব ভুয়ো স্বাধীনতার কোনো মূল্য নেই।"

আমাদের পেছনে গোয়েন্দা মহাশয়গণ -- আমরা কী বলি না-বলি শোনবার জন্য কান পাততে এসেছিল, আমরা ফেরি-বোটে উঠলাম। গোয়েন্দা আমাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করল।

সন্ধ্যা হয়-হয়, পশ্চিমের সূর্যের সোনালি কিরণ নদীবক্ষে

পড়ে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছিল। তরঙ্গায়িত জলে রবিরশ্মি ঢেউ খেলে পশ্চিমমুখী সূর্যের দিকে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলছিল। এ দৃশ্য সর্বত্র দেখা যায় না। যেসব নদী পশ্চিমগামী সেই নদীতেই এই দৃশ্য দেখা যায়।

সন্ধ্যার পর আমরা ওপারে এলাম। সাইখোয়া ঘাটের আশেপাশে গ্রাম ছিল বটে, কিন্তু বহুদূরে। স্টেশনেই রাত কাটাব স্থির করে প্ল্যাটফর্মের একদিকে আড্ডা গাড়লাম। কতক্ষণ পর কয়েকখানা গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আনা হয়েছিল। পরদিন আটটায় গাড়ি ছাড়বে। গাড়িতেই রাত কাটাব মনস্থ করলাম। ইতিমধ্যে একজন কলকাতাবাসী বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বোধহয় রেল-কোম্পানিতে কোনো কিছুর সাপ্লাই দিতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিপত্তি ছিল খুব বেশি। কোথা থেকে খাদ্য আনিয়ে আমাদের খাওয়ালেন, তারপর প্রথম শ্রেণির কম্পার্টমেন্ট খুলে দিয়ে রাত কাটাবার সুযোগ করে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। অসম ও বাংলাদেশের মধ্যে ইনিই প্রথম আমাদের প্রতি আতিথ্য দেখিয়েছিলেন।

সেই ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি নাম বলতে অস্বীকার করে বলেছিলেন, "নাম কেনবার জন্য আপনার সাহায্য করিনি, এটা আমার কর্তব্য।"

হায় রে যে-যুগের বাঙালি! নামের ভিখারি তারা তখন ছিল না। যে-জাতি যখন এগিয়ে চলে তখন তারা নামের ভিখারি মোটেই হয় না। জাতির অধঃপাতের সঙ্গে নামের প্রতি মোহ আসে এবং জাতি জাহান্নামে যেতে থাকে। আজ আমরা কোন্ দিকে?

অসম

১

আমাদের দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে যে-বিরাট ভূখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়, তাকে অসম প্রদেশ নাম দেওয়া হয়েছে। অসমিয়াদের বাসস্থান বলেই সেই ভূখণ্ডের নাম অসম হয়েছে। অবশ্য এই নাম ব্রিটিশের আমলে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে এই দেশের নাম ছিল কামরূপ। মহাভারতে অসমের পূর্বের নাম কামরূপই দেখা যায়। যা-হোক, অসম অথবা কামরূপ নাম নিয়ে আমি মোটেই মাথা ঘামাই না। এ-দেশে এলেই দেখা যায় স্ত্রী-প্রাধান্য। স্ত্রী-পুরুষে সমতা দেখা যায় কোরিয়ায়, অসমে দেখা যায় স্ত্রীলোকের প্রাধান্য। আদিযুগে পৃথিবীর সর্বত্র লিঙ্গ-উপাসনার প্রাধান্য ছিল। গ্রেট ব্রিটেন থেকে জাপান পর্যন্ত সর্বত্র লিঙ্গ-উপাসনার জয়জয়কার ছিল। মহম্মদ, জিশু, শংকর, এই তিনজন অবতারই ঈশ্বরের বিশেষণ পিতা অথবা সেই শ্রেণির শব্দ ব্যবহার করেছেন। কনফুসিয়াস স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা অপহরণ করেছিলেন। সর্বত্র দেখা যায়, ঈশ্বর সম্বন্ধে যখনই কিছু বলা হয়েছে তখনই পুংলিঙ্গ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু অসমেই শুধু তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

বিষয়টি অতি সংক্ষেপে এবং সোজা ভাষায় বলা হলো, গুরুত্ব তেমন দেখা যায় না, কিন্তু ঐতিহাসিকদের কাছে এর গুরুত্ব আছে। পর্যটক মরগেন বার বার স্ত্রী-জাতির শক্তিহীনতার নিদর্শন দেখিয়ে পুরুষরা কী করে স্ত্রীলোকের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল তা বিশদভাবে বলেছেন। কিন্তু তিনি অসম ভ্রমণ করেননি অথবা অস্ট্রিক জাতির বিশেষত্ব অনুধাবন করবার সুযোগ পাননি। ইসলাম এবং ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতি-অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়া দেখে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, অবনত মস্তকে তা স্বীকার করি, কিন্তু পুরনো থাই জাতির দিকে যদি তিনি চেয়ে দেখতেন তাহলে বুঝতেন, তিনি এক নূতন জগতে এসেছেন।

থাই জাতি এবং বর্তমান বাঙালি জাতির মধ্যে সাদৃশ্য অনেক রকমেরই ছিল এবং এখনও আছে। সেই থাই জাতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক স্থানে ছিল এবং এখনও আছে। অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে, অনেকে কোনো ধর্ম গ্রহণ করেনি, তারা এখনও মহামায়া শক্তি দেবীর আরাধনা বর্বর-প্রথায় পালন করে। উত্তরে চিন, পূর্বে ইন্দোচিনের তংকিন, আনাম, কোচিন চিন, দক্ষিণে কতটুকু পর্যন্ত আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কারণ নিউগিনিতে আমি যাইনি। আন্দামান বিশুদ্ধ নিগ্রোয়াইট, পূর্বে — বিহার, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম। এতটুকু স্থানে যাদের বাস তাদের অপর নাম একদা 'থাই' ছিল। 'থাই' মানে স্বাধীন। স্বাধীনতারও একটি পরিমাণ আছে। যাদের স্বাধীনতার কোনো পরিমাণ নেই তারাই নিজেকে স্বাধীন বলতে সাহস করে।

শ্যামদেশে দেখা যেত (এখন দেখা যায় কি না জানি না), কোনো স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে আজ বিয়ে করে পরের দিন তালাক দিয়েছে। এর কোনো কারণ নেই। ভালো লাগল না, ছেড়ে দিল, তাতে কী আসে যায়? আমাদের কিন্তু অনেক কিছু আসে যায়, কারণ আমাদের ধর্মগুলি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে। সেজন্যই আমাদের চোখে থাই-প্রথা বেশ আঘাত করে, অথচ থাইদের মধ্যে এটা হলো সাধারণ

নিয়ম।

অসমে প্রবেশ করা মাত্রই দেখা যায়, যারা সত্যিকারের অসমিয়া তাদের স্ত্রীলোক বাস্তবিকই স্বাধীন। অসমে আজ যারা সত্যিকারের অসমিয়া তারা সকলেই থাই। তাদের স্থাপিত কামাখ্যা-মন্দির যদিও ব্রাহ্মণ্য-মতবাদ এবং আচার-ব্যবহারের প্রাবল্যের দ্বারা নিজস্ব করতে সক্ষম হয়েছে, তবুও তাদের বিশেষত্ব রয়ে গেছে। যখনই আমি সেই বিশেষত্ব দেখাতে আরম্ভ করব তখনই সকলে বলবেন, "এটা তো তান্ত্রিক মতবাদ, এতে আর নূতনত্ব কী?" কিন্তু তান্ত্রিক মতবাদ কোথা থেকে এল, কেন এল, তা প্রথমে জানতে হবে। যদি সেদিকে চেয়ে দেখা যায় তাহলে পুনরায় আমরা থাই জাতির মাতৃদর্শন জানতে বাধ্য হব।

থাই জাতি আগাগোড়া মায়ের উপাসক। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেমন পিতার উপাসক ছিল, থাই জাতিও তেমনই মায়ের উপাসক ছিল। পিতাকে থাইরা কোনোরূপ প্রাধান্য দিত না। পিতা থাকলেও চলত, না-থাকলেও চলত। কিন্তু মা যার থাকত না তার পক্ষে জীবন ধারণ করাই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠত, এই সত্যটুকু থাই জাতি বুঝতে পেরেছিল। তারই বিকাশের জন্য মহাভারতের যুগেও আমরা কামাখ্যা দেবীর কথা, কামরূপের কথা নানাভাবে শুনেছি এবং ভবিষ্যতে যখন থাই জাতির ইতিহাস থাইরা লিখবেন তখন আমরা জানতে পারব।

মাতৃমঙ্গল-বিষয়ক প্রবন্ধ আমেরিকান জার্নালগুলিতে যেমন দেখা যায় তেমন দেখা যায় না ইংরেজি জার্নালগুলিতে। অথচ উভয় দেশেই প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম বর্তমান। যে-কোনো রকমে মাতৃমঙ্গল-বিষয় নিয়ে আমেরিকান বিজ্ঞানীগণ অনেক গবেষণা করেছেন বটে কিন্তু থাই জাতিকে একেবারেই উপেক্ষা করে গেছেন। তবুও কয়েকজন ডাচ এবং ফরাসি পর্যটক থাইদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা বড়ই চমকপ্রদ এবং জ্ঞানবৃদ্ধিকারক।

আংকোর মন্দির সম্বন্ধে ফরাসি পর্যটকগণ সন্দিহান হয়ে অনেক কথা বলেছেন, সত্য কথা যেন তাঁদের বলার ইচ্ছা ছিল না। আংকোরভাট কোনোকালে বুদ্ধ-বিহার ছিল না। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন হবার পূর্বে এই মন্দির তৈরি হয়েছিল। তখন কী মূর্তি সেখানে ছিল, বলা কষ্টকর। কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে বাস্তবিক কোনো মূর্তি নেই। যেসব মূর্তি আমরা দেখতে পাই, সবই নূতন। এমন-কি মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের। কামাখ্যা দেবীর মন্দির পাঠানরা ভেঙেছিল, তারপর রাজা শিব পুনরায় গঠন করেন। সেই মন্দিরে শুধু যোনিরই লক্ষণ রয়েছে। ঠিক সেরূপ করে যদি আংকোরভাট কেউ দেখেন তাহলে দেখবেন, সেখানেও যোনিরই ছাপ, আর কিছুই নয়। পরবর্তী বৌদ্ধযুগে বুদ্ধদেবের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পুনুমপেন অথবা ব্যাংককে যেসব ভারতবাসী বৌদ্ধধর্মের বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কেউই আংকোরভাট দেখেছেন বলে মনে হয় না। তবুও বলা হয়, আংকোরভাটে কোনো এক সময়ে শিবলিঙ্গ ছিল। আমিও সেই মত পোষণ করতাম, কিন্তু কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখার পর সেই ভ্রান্তি দূর হয়েছে। মাতৃদর্শনে মায়ের মূর্তি থাকে না। মা মা-ই, তাঁর কোনো মূর্তি গড়তে পারা যায় না। আসলে মাকে পূজা করাই ছিল মাতৃদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য। নকল মা অর্থাৎ প্রতিমা-পূজার পদ্ধতি থাইদের মধ্যে ছিল না এবং অসমেও তদ্রূপই ছিল। আজ যদি কেউ থাই বংশের কোনো অসমিয়াকে এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করেন তাহলে সে কিছুই বলতে পারবে না। দেখতে হবে তার আচার-ব্যবহার। অসমিয়াদের মধ্যে দুর্গা-কালী এসবের পূজার প্রচলন নেই। অসমিয়ারা মাত্র দুটি প্রাকৃতিক পর্ব পালন করে — হারিবিষু এবং মহাবিষু। হারিবিষু আদি, মহাবিষু নূতন। 'হারি' মালয় শব্দ অর্থাৎ থাই শব্দ। তার মানে "দিন অথবা রোজ"। 'বিষু' শব্দ বোধহয় খাঁটি দক্ষিণি। এতেই বুঝতে পারা যায় অসমিয়াদের সঙ্গে থাইদের একত্ব। মহাবিষু আধুনিক এবং কর্জ করা। আসলে মহাবিষু আষাঢ় মাসে হয়ে থাকে এবং এই নিয়ম মালয়, শ্যাম, কম্বোজ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে দেখা যায়। আষাঢ় মাসের অমাবস্যাই হলো মহাবিষুর সঠিক তারিখ। কেন এই দুটি দিন থাই অথবা অস্ট্রিকদের মধ্যে বিশেষ দিন, সেই বিষয়গুলি এখানে বলা বড়ই কঠিন এবং অনেক পুস্তক থেকে অনেক কথা উদ্ধৃত করতে হবে, সেজন্য পরিত্যাগ করা হলো।

তারপর এই জটিল বিষয় নিয়ে অসমিয়ারা কোনোরূপ আলাপ-আলোচনা করতে মোটেই রাজি হন না। কী জানি, বর্তমান রাজনীতি যদি আলাপ-আলোচনার মধ্যে এসে যায়! আমি ধন্যবাদ দিই অর্থাৎ প্রশংসা করি সাইদুল্লা, আকবর হাইদরি এবং মিশনারিদের। তাঁরা অসমিয়াদের মুখ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। অসমিয়াদের ভয়, কথার ফাঁকে রহস্য যদি প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে মহা বিপদ হবে। সাইদুল্লা, আকবর হাইদরি এবং মিশনারিরা নাগা, কুকি, খাসি, গারো, মিরি, মিশমি এবং

অন্যান্য উপজাতিকে অসমিয়াদের কাছ থেকে আগাগোড়া পৃথক হবার জন্য উসকানি দিয়ে আসছে। ফলে আজ আমরা স্বাধীন নাগা, স্বাধীন গারো-স্থানের জিকির শুনতে পাই। আমাদের দেশের অনেককেই Self-determination শব্দ ব্যবহার করতে শুনতে পাই। কিন্তু এই শব্দ দুটি মার্ক্স আবিষ্কার করেন এবং এ-দুটি তখনই আরোপ করা হবে যখন কোনো দেশ প্রোলিতারিয়েত ডিক্টেটর কর্তৃক পরিচালিত হবে। সুবিধাবাদীরা এই দুটি শব্দ নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে দেখে দুঃখ মোটেই হয় না, শুধু সুবিধাবাদীদের ক্ষণস্থায়ী বিজয়গর্ব দেখে হাসি পায় এবং সেইসঙ্গে মনে হয়, তাণ্ডব নৃত্যের সময় ক্ষণস্থায়ী। দু-দিন বই তো নয়, নেচে নাও।

অসমের রাজপথে পা দেওয়ামাত্রই বুঝতে পেরেছিলাম, অসমিয়ারা কত কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছে! অবশ্য পথের দু-দিকে বাঙালি, মাড়োয়ারি, হিন্দুস্থানিও দেখতে পেয়েছিলাম। মাড়োয়ারি এবং হিন্দুস্থানিরা সরকারি কাজের জন্য লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করত না। আমার স্বজাতি, বিশেষ করে আমার জেলাবাসীরা যখন অসমিয়াদের বিরুদ্ধে আমার মতো পর্যটকের কাছে নালিশ করতেন তখন বলতে বাধ্য হতাম, "বন্ধুগণ, এখানে এসে চাকরির দাবি না-করে যাতে ব্যাবসা-ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারেন সে-চেষ্টা করুন, দেখবেন এ-দেশ আপনাদের হয়ে যাবে। অসমিয়াদের দূরে রেখে 'বেঙ্গলি ক্লাব' করলে এ-দেশে থাকতে পারবেন না। হিন্দুস্থানির বাড়িতে শনিপূজা হলে অসমিয়ারা নিমন্ত্রিত হয়। তারা আসে, আনন্দ করে এবং হিন্দুস্থানিদের নিজেদের লোক মনে করে। আপনারা অসমিয়াদের দূরে রাখবার চেষ্টা করেন, সেজন্য ঘৃণিত হন। ভবিষ্যতে হয়তো বিপদেও পড়তে পারেন।"

আমার কথা শুনে অনেকে বিরক্ত হতেন, এমন-কি থাকতে পর্যন্ত দিতেন না। কিন্তু আজ যদি তাঁরা পূর্বের কথা স্মরণ করেন তাহলে দেখবেন, আমি যা বলেছিলাম তা সত্য কি না!

তখন বোধহয় বেলা নয়টা হবে, একজন চা-বাগানের সাহেব ঘোড়ার গাড়ি করে কোথায় যাচ্ছিল। পথটা ছিল খুব বিশাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৌলতে সেই পথই বর্তমানে অসমে জি.টি. রোডে পরিণত হয়েছে। আমরা দুজন চলেছি। সাহেবটা সামনে দিয়ে আসছিল। সে হয়তো ভাবছিল, আমরা সাইকেল থেকে নেমে হাত জোড় করে মাটিতে বসে পড়ব, কিন্তু আমরা তা করিনি। পাশ দিয়ে চলছিলাম। সাহেবটা কেন একটু সরে গেল না, সেজন্য শৈলেন অনুযোগ করছিল। কিন্তু সেদিনই বিকেলের দিকে দেখলাম, একজন অসমিয়া সাইকেল থেকে নেমে সাহেবকে নমস্কার জানিয়ে পথ ছেড়ে দিয়েছিল। এই দেখে আমার স্ব-জেলাবাসী বন্ধুরা অসমিয়াদের বিদ্রুপ-বাক্য নিক্ষেপ করতেন, তাদের এরূপ কিছু করতে নিষেধ করতেন। তাঁরা সে-ভাব যদি না-দেখাতেন তাহলে শ্রীহট্ট জেলা আজ আর পাকিস্তান হতো না। এ-সম্বন্ধে পরে অনেক কথাই বলব।

প্রথম দিন আমরা যে-গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই গ্রামে অসমিয়ার সংখ্যাই ছিল বেশি। একজন অসমিয়া সমাদর জানিয়ে তাঁর বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন। তাঁর নাম অরুণ গোস্বামী। তিনি বাংলা বেশ বলতে পারতেন। তাঁর ঔদার্য এবং আমাদের প্রতি দয়া দেখে মোহিত হয়েছিলাম। শর্মা, গোস্বামী এবং আরো কয়েক শ্রেণির ব্রাহ্মণ সমস্ত অসমিয়া সম্প্রদায়ের শাসক অর্থাৎ তাঁদের বিধানই হলো শাস্ত্র। এই প্রকার লোকের বাড়িতে সমাদরে গৃহীত হওয়াও সুখের কথা। অবশ্য তখনকার দিনে আমার গোত্র কেউ জিজ্ঞাসা করত না, চিনের কথাই সকলে জিজ্ঞাসা করত।

গোস্বামী মহাশয়ের পূর্বপুরুষ হয় নবদ্বীপ, নয় ভাটপাড়া থেকে অসমে বসবাস করতে গিয়ে সেখানকার চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। পূর্বকালে কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া এবং দক্ষিণ-শ্রীহট্টে বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকের বসবাস ছিল। গোস্বামী মহাশয় তাঁর পূর্বপুরুষের কথা এবং উপকথা বলে আমাকে তৃপ্ত করেছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অবয়ব দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁর শরীরে নব্বই পারসেন্ট দ্রাবিড়-রক্ত এবং দশ পারসেন্ট অসমিয়া-রক্ত। তাঁর ঠোঁট বেশ পাতলা, চোখ দুটো বড়, চিক্-বোন্‌টা কিছু উচ্চ। তাঁর স্ত্রী কিন্তু খাঁটি অসমিয়া বলেই মনে হচ্ছিল। অসমিয়া এবং দ্রাবিড়-রক্তের সংমিশ্রণে মানায় বেশ।

তখন নন-কোঅপারেশনের যুগ। সবাই জেলে যায়, গোস্বামী মহাশয়ও তিন মাস জেলে ছিলেন। এতে তাঁর গোঁড়ামি নষ্ট হয়েছিল। যাঁর বাড়িতে অন্য লোক গেলে পরিবার শুদ্ধ সকলে স্নান করে পবিত্র হতেন, সেই পরিবারে তখন যে-কেউ খেতে পারত, উচ্ছিষ্ট কাউকে ফেলতে হতো না। গোস্বামী পরিবারের সামাজিক পরিবর্তন দেখে মহাত্মা গান্ধীকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম অন্তরে অন্তরে।

সন্ধ্যার পর সাইদুল্লা-ক্রিকের কথা উঠল। গোস্বামী মহাশয় সব দোষ বাঙালিদের ঘাড়ে চাপালেন এবং কেন বাঙালিরা দোষী,

তা-ও বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীহট্টবাসীরা চাকরি জোগাড়ের জন্য সাইদুল্লাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। যদি তা না হতো তাহলে অসমে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব গঠন হতো। তিনি চোখের সামনে দু-একটি নিদর্শন দেখিয়ে দিলেন।

গোস্বামী মহাশয় যা বলেছিলেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য। আজ যাঁরা শ্রীহট্টকে পাকিস্তানভুক্তির জন্য বরদলৈকে দায়ী করেন তাঁরাই অনেক দিক দিয়ে শ্রীহট্টকে পাকিস্তানে ঠেলে দিয়েছিলেন — অবশ্য আকবর হায়দরির চতুরতা যে তাতে ছিল না তা বলা চলে না। এসব হলো আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

গোস্বামী মহাশয়কে যখন বুঝিয়ে দিলাম, অসমের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অসমের অনেকগুলি জেলা নিয়ে ব্রিটিশ নূতন এক দেশের সৃষ্টি করতে চায়, তখন তিনি যেন গাছ থেকে পড়লেন! সুখের বিষয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে। গোস্বামী মহাশয় আমার কথা শুনে যেমনভাবে হতাশ হয়েছিলেন, তাঁর সেই হতাশার অপসরণ হয়েছে।

২

অসমের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত থেকে প্রবেশ করতে হলে সর্বপ্রথমে তিনসুকিয়া শহর পথের পাশে পড়ে। তিনসুকিয়াতে আমরা অতিথি হয়েছিলাম গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে। শহরের বিশেষত্ব ছিল। এখানে রেলওয়ে জংশন এবং ব্যবসায়ীদের আড্ডা ছিল। এখান থেকে সদিয়া-ফ্রন্টিয়ার জেলায় পণ্য রপ্তানি হতো।

শহরে পৌঁছেই নিজের দুজন গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। একজন ব্যবসায়ী, অন্যজন পি.ডব্লিউ.ডি.-র মুহুরি। তারা আমাকে পেয়ে সুখী হয়েছিল কিন্তু তাদের অসমিয়া-বিদ্বেষ এবং উক্তি আমার সহ্য হচ্ছিল না। পরের দিন স্থানীয় হাই ইংলিশ স্কুলে একটি লেকচার দেবারও বন্দোবস্ত হয়েছিল। যাঁরা লেকচারের বন্দোবস্ত করেছিলেন তাঁরা সকলেই ঢাকা জেলার বাসিন্দা। অথচ শ্রীহট্ট জেলার লোক সেখানে বহু ছিল। ঢাকা জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে সকলেই ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত ছিলেন। তাঁদের চালচলন, কথার পদ্ধতি অন্তত আমাকে মুগ্ধ করেছিল, অথচ আমার জেলারই সুশীল সেন পনেরো বৎসরের ছেলে হয়ে পনেরোটা বেতের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন কলকাতায়। সুশীল সেন অমর হয়েছেন নির্যাতনকারী শ্বেতাঙ্গকে নির্যাতন করে, কিন্তু তাঁরই স্বজেলাবাসী শিক্ষিত যুবকেরা চাকরির জন্য উন্মত্ত হয়ে যার-তার পেছনে হামলা করছে দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম।

এখানে 'প্রোগ্রেসিভ স্টাডি ক্লাব'-এর দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে ঘরোয়া বৈঠকে যোগদান করি। প্রোগ্রেসিভ স্টাডি ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির অনেকেই ছিলেন। তাঁদের কাছে আমার প্রথম কথাই ছিল, চিনা সভ্যতা অথবা সোভিয়েত-রুশিয়ার আচার-ব্যবহার আমাদের সভ্যতার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না, অতএব চিন অথবা রুশকে অনুকরণ করে আমাদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অবতরণ করা মোটেই কাম্য নয়। অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধীকেও মেনে চলা সম্ভবপর নয়। সভার সভ্যগণ আমাকেই প্রশ্ন করলেন, "তবে কী করে আমাদের মুক্তি সম্ভব হতে পারে?"

সে যুগ আর বর্তমান যুগ এক নয়, অতএব পূর্বের কথার পুনরাবৃত্তি এখানে শুধু বাজে কথা হবে না, প্রকৃতপক্ষে হবে চালবাজি।

তিনসুকিয়ার মতো স্টাডি ক্লাব অসমের আর কোথাও দেখতে পাইনি। প্রোগ্রেসিভ ক্লাবের সভ্যগণ কেন-যে তিনসুকিয়াতে তাঁদের আড্ডা গেড়েছিলেন, তাঁরাই ভালো করে জানতেন। বিদেশের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য তিনসুকিয়া তখনকার দিনেও যেমন নগণ্য স্থান ছিল, বর্তমানে তদ্রূপই রয়ে গেছে।

তিনসুকিয়া থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত যে-সদর রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তায় সাইকেলের উপর দাঁড়িয়ে হিমালয় পর্বতের শুভ্র শিখর দেখে শৈলেনের খুবই আনন্দ হয়েছিল। সে ভুলে গিয়েছিল নিজেকে, বোধহয় আনন্দে চিৎকার করছিল, এটাই ছিল আমার ধারণা। কিন্তু আসলে সে হিমালয় দেখে আনন্দিত হয়নি, তার মনে যে-গোপন তথ্য ছিল তার অনেকটা প্রকাশ করেছিল। আফজল খানকে হত্যা করে শিবাজি যতটুকু আনন্দ পেয়েছিল, শৈলেন সেই আনন্দের অপেক্ষায় ছিল। পরে বুঝতে পেরেছিলাম তার উদ্দেশ্য।

ডিব্রুগড় পৌঁছে আমরা ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে উঠি। তিনি ছিলেন অতি সদাশয় ব্যক্তি — কংগ্রেসের একান্ত ভক্ত। তাঁর ছেলে ডাক্তারি পেশা পরিত্যাগ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর ডাক শুনে। এখানেও লেকচার দিই, শহরের লোক আমাকে নিয়ে বেশ হইহল্লা করতে থাকে, যেন একটি পর্ব! আনন্দ করা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না। এ-ছাড়া আমার ভ্রমণ-কাহিনি বলার মধ্যে থাকত একটু রাজনৈতিক ছাপ। তার মানে, একটু

দেশোদ্ধার হয়ে যাচ্ছিল।

ডিব্রুগড়ে চারদিন ছিলাম। পঞ্চম দিন সন্ধ্যার সময় শিবসাগরে পৌঁছই। এখানে আমি ব্যস্ত ছিলাম শিবসাগর দিঘি দেখতে, মন্দির দেখতে, অসমিয়া রাজাদের রাজধানী দেখতে এবং শৈলেন ব্যস্ত ছিল তার নিজের কাজে। কোথায় চলে যেত সে, ফিরে আসত ঠিক খাবার সময়ে। ভয়ে জিজ্ঞাসা করতাম না কোথায় গিয়েছিল।

এখানে দেখা হলো এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। তাঁর নাম জালালউদ্দিন হাজারিবন। খাঁটি অসমিয়া। নাক চ্যাপটা, চুলগুলি চিনাদের মতো, শরীরের রং পীত। বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে বসে অসমিয়া আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলাম। সাইদুল্লার অভ্যুত্থানের সঙ্গে অসমিয়া মুসলমানদের মধ্যে পর্দা-প্রথা প্রবেশ করেছে, হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেসে যোগ না-দিয়ে মুসলিম লিগের সভ্য হতে বাধ্য করা হয়েছিল ইত্যাদি। জালাল পল্টনি লোক। সে রাজনীতির পাশ দিয়ে যেত না, বাড়িতে ছুটিতে এসেছিল। সে ফিরে যাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।

এখানকার অসমিয়া রাজাদের পুরনো প্রাসাদ যাঁরাই দেখেছেন তাঁদেরই বোধহয় বসে চিন্তা করতে হয়েছে। অসমিয়া রাজা এবং তাঁদের পুরনো প্রাসাদ চিন্তাশীল পর্যটকদের চিন্তার উদ্রেক করে। এখনও-যে দু-একখানা অস্ত্র এবং কারুকার্যখচিত প্রস্তর দেখতে পাওয়া যায় তা দেখে মনে হয় না জিনিসটা ইদানীন্তন কালের। উপরন্তু বৃষ্টি ও উত্তাপের দেশে জিনিস তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। সে-দিকটা না-তলিয়ে যাঁরাই অসমিয়া সভ্যতার সমালোচনা করেছেন তাঁরাই করেছেন ভুল। শিবসাগরের পুরনো রাজপ্রাসাদের সঙ্গে ব্যাংকক, মৌল্‌মিন এবং উত্তর-বর্মার রাজপ্রাসাদের সাদৃশ্য রয়েছে। অসমিয়ারা যা-ই বলুন-না কেন, আমার মনে হয় তাঁদের সঙ্গে থাইদের যত নিকট-সম্বন্ধ, অন্যান্য মংগোলিয়ানদের সঙ্গে তত নিকট-সম্বন্ধ নেই। নৃতত্ত্ববিদেরা ব্রাউন মংগোলিয়ান (Brown Mongolian) বলে কোনো শব্দের সৃষ্টি করেননি। আমিই এই শব্দ বার বার ব্যবহার করছি। আমার মনে হয় যাদের অস্ট্রিক (দক্ষিণে) বলা হয়, তাদের যদি ব্রাউন মংগোলিয়ান বলা হয় তাহলেই হবে ভালো। দ্রাবিড়দের অস্ট্রিকের ভেতর কোনোমতোই আনা চলে না। যদি আনা হয় তাহলে আমি এখনই তার প্রতিবাদ করছি এবং সেটা মস্ত বড় ভুল।

দুদিন কাটালাম শুধু পৌরাণিক তথ্য দেখে। অনেকেই আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইছিলেন। তাঁদের নিরাশ করতে হয়েছিল নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে।

শিবসাগর থেকে জোড়হাটের পথে দুদিন কাটাতে হয়েছিল। একদিন কাটিয়েছিলাম এক অসমিয়া জমিদার-বাড়িতে। অসমিয়া জমিদার এবং বাঙালি জমিদারের মধ্যে ঢের পার্থক্য। হাম্‌কি-তুম্‌কি মোটেই দেখতে পাইনি। জাতিভেদের পৈশাচিক তাণ্ডব নৃত্য মোটেই লক্ষ করা যায় না। জমিদার-বাড়িতে যারাই আসছিল তারাই উপযুক্ত সমাদর পাচ্ছিল। অন্তত তুই, তুমি এই দুটি শব্দ জমিদারের মুখ দিয়ে বের হয়নি। আমারই সামনে এমন কতকগুলি বিষয়ের নিষ্পত্তি হয় যা আমাদের জমিদার হলে প্রজার পক্ষে কত দুর্গতি ভোগ করতে হতো বলা শক্ত। যদিও কাস্টইজ্‌ম অসমিয়াদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং আরো প্রবেশ করেছে উৎকটরূপে, তবুও এর বিকট রূপ আমাদের মধ্যে যেমন করে প্রকটিত হয়েছে তেমন অসমিয়া সমাজে প্রকটিত হয়নি। অসমিয়ারা এক ঝাঁকানিতে জাতিভেদের বিকটত্ব ঝেড়ে ফেলতে পারবে এটা আমার প্রবল ধারণা।

এর পরের দিন দেখা হলো এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে, তিনি জঙ্গলে শিকার করেন। আমাদের পরিচয় পেয়ে তাঁর ক্যাম্পে নিয়ে গেলেন। সেখানে বন্য জীব শিকার হয়নি, তবে বন্য জীবের মাংস ভক্ষণ করে তৃপ্ত হয়েছিলাম। অসমের জঙ্গল কীরূপ, সেদিন কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।

জঙ্গল শুষ্ক ভূমিতে অবস্থিত। প্রায়ই উলু ঘাস। উলু ঘাসে যেমন করে বাঘ লুকিয়ে থাকে তেমনই লুকিয়ে থাকে সাপ। সাপ এবং বাঘের সমাবেশ যেখানে সেই স্থান কত ভয়াবহ সহজেই বুঝতে পারা যায়। হাতির ওপর বসে শিকারে গিয়েছিলাম। একটি বুলেটও খরচ করতে হয়নি। হরিণ ছাড়া গভীর রাতে আর কোন্ পশুর দেখা পাওয়া যেতে পারে — তা-ও উলুবনে? ফিরে এসেছিলাম রাত চারটের সময়। পরের দিনটা কেটেছিল শুধু ঘুমিয়ে।

জোড়হাট পৌঁছেই আমরা অতিথি হয়েছিলাম একজন অসমিয়া ভদ্রলোকের বাড়িতে। সেদিন তাঁর এক আত্মীয় সবে মাত্র জেল থেকে ফিরেছিলেন। সেই যুবকের শরীর খুব দুর্বল ছিল, তিনি ক্রমাগত বমি করছিলেন। প্রাইভেট ডাক্তার তাঁকে শুইয়ে দিয়ে ঔষধের ব্যবস্থা করেছিল। জেলখানার অত্যাচারে যুবকের এই অবস্থা! আমার চোখে, এটাই বোধহয় সর্বপ্রথম

রাজনৈতিক দুর্ঘটনা।

শৈলেন তো এই দেখেই লাফিয়ে উঠেছিল। "হারামজাদা ব্রিটিশ!" বার বার বলছিল সে। আমি কিছুই বলিনি। চিনদেশে পশুপ্রকৃতির লোক চিয়াং কাইশেকের অনেক অত্যাচারই দেখেছিলাম বলে একটুও দুঃখ হয়নি। চিনদেশে জেলে নিয়ে অত্যাচার করা তো মামুলি কথা। যে-দেশে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করেছিল চিয়াং কাইশেক, সে-দেশের অত্যাচারের সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ অত্যাচার মামুলি। যুবকটি আইন অমান্য করেছিলেন, সেজন্য পুলিশ সর্বপ্রথম তাঁকে বেশ করে উত্তমমধ্যম দিয়েছিল, তারপরে জেলে পাঠিয়েছিল। সেখানে ডাক্তার ছিল, ঔষধ ছিল, কিন্তু রোগীর আরামের ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের দেশই হলো অপরূপ। মহাত্মা গান্ধীর আদেশ মেনে অনেক যুবক-যুবতী অকালে পক্বকেশে পরিণত হয়েছিল। অসহযোগ আইন-অমান্য আন্দোলন ছিল খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার কারণ, কেউ যেন তা মনে না-করেন। কারণ যা ছিল, দরকার হলে অকারণেও একদিন বলতে বাধ্য হব, আপাতত বিষয়টি স্থগিত থাক। হাজার হোক রাষ্ট্রনীতি বুঝি, বিদেশের সংবাদ কিছুটা রাখি, অতএব সময়মতো সবই বলার ইচ্ছা রাখি।

একদিন একটি পর্ণকুটিরে একজন অসমিয়াকে হুঁকোয় তামাক খেতে দেখে তার হুঁকোটা চাইলাম। সে দিল না, দিল কলকিটা। কলকিতে তামাক খাওয়ার অভ্যাস শুধু যজমানি ব্রাহ্মণ এবং মুসলমানদের মধ্যেই দেখেছিলাম, ছিলিম ধরে কখনো তামাক খাইনি। দ্বিতীয়ত, ছোটবেলা থেকেই আমি জাতিভেদ মানতাম না, এমন-কি মুসলমানের সঙ্গেও না। ডান্ডার জোর ছিল, সেজন্য সমাজ ছিল আমার অথবা আমাদের পদানত, আমরা সমাজের পদানত ছিলাম না। যা করেছি তা-ই ছিল আমাদের সামাজিক নিয়ম।

কলকিটা বুট দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নদী পার হবার জন্য নদীতীরের কুঁড়েঘরটাতে বসে রইলাম। কতক্ষণ পর খেয়ানি এসে নদী পার করে দিল। তাকে উপযুক্ত মজুরি দিয়ে ওপারে গিয়ে আর-একটা কুঁড়েঘরে বসতে হলো। শৈলেন বলল, সে খাবে। দই, চিঁড়ে, গুড় এবং কলা ছিল সেখানে। শৈলেন খুব খেল, আমি খেলাম না। বার বার নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ছিল দই-চিঁড়ে দেখে।

সেদিন ইচ্ছে করেই একজন কংগ্রেসির বাড়িতে উঠলাম। কংগ্রেসি জেল-ফেরতা, অতএব উদার। তাঁর জাত জেলেই চলে গিয়েছিল, সেজন্য তিনি কারো জাত জিজ্ঞাসা না-করেই তাকে খেতে দিতেন। কংগ্রেসি ভদ্রলোক বলছিলেন, স্বাধীনতা পেলে একদিনে জাতিভেদ উঠিয়ে দেবেন। কই, কিছুই তো গেল না, তবে কি আমরা স্বাধীনতা পাইনি?

এদিকের মাটি বড়ই সুন্দর। গরমের সময়েও সকাল-বিকেল শীতল স্নিগ্ধ বাতাসের অভাব হয় না। যেদিকে দৃষ্টি যায় সর্বত্র সবুজ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। পথ চলার সময় বড় বড় সাপ পথের ওপর দেখা যায় কিন্তু ভয় করতে নেই। তাড়া করলেই পালিয়ে যায়। সাপ বোধহয় মানুষকে জানে। ছোট্ট একটা মানুষ একটা অজগর সাপকে তাড়া করলে পালায় কেন? অথচ মানুষের চেয়েও বড় বন্য জীব হরিণ, গরু, শূকর ধরবার জন্য সে ওত পেতে বসে থাকে। কয়েকটা অতিকায় সাপের শরীরের ছাপ এদিকে দেখতে পেয়েছিলাম। বাঘ-যে নেই, বলা চলে না। কিন্তু বাঘ একটিও দেখতে পাইনি।

এদিকের নদীগুলি অতীব গভীর এবং স্রোত প্রখর। নদীতে বাস উঠিয়ে যাঁরা বাসে বসে থাকেন অথবা মোটরে বসে থাকেন তাঁদের আমি বোকা বলব। নৌকা যদি ডুবে যায় তাহলে মোটর-আরোহীর সন্ধান পাওয়া যাবে না। আমাদের সঙ্গে যাঁরাই মোটরে পার হতেন তাঁদের মোটরে বসতে দিতাম না। অসমিয়া ভদ্রলোকেরা আমাদের আদেশ মান্য করতেন। আমার স্বজাতি বাঙালি ভায়ারা বলতেন, "এটা আপনার মোটরকারও নয় এবং ফেরিবোটও সরকারি, অতএব আপনার বলার মতো কিছুই নেই।" আমরা কিন্তু এসব মানতাম না। মোটর থেকে যাত্রীকে নামিয়ে দিতাম এবং বলতাম, "আপনার মৃত্যু দেখে আমরা সুখী হব না। নদীর ওপারে গিয়ে মোটরও আপনার, পথও সরকারের, যা ইচ্ছে তা-ই করবেন।" এতে অনেকে অসন্তুষ্ট হতেন।

শৈলেন বলত, দেখলেন তো ঝান্ডা ও ডান্ডার শক্তি? ঝান্ডা মানে পোশাক, ডান্ডা মানে হাতের শক্তি। শুধু শক্তিতে কিন্তু কিছুই হয় না, ঝান্ডারও দরকার। আমি আমাদের দেশের অবস্থা ভালো করে জানতাম না, সেজন্যই শৈলেনের কথার প্রতিবাদ করতাম না। এখন দেখছি শৈলেনের কথাই ঠিক, আমাদের দেশে ঝান্ডা এবং সেইসঙ্গে ডান্ডার অতীব দরকার। চিনদেশেও তার কতকটা আভাস পেয়েছিলাম। অ্যান্টি-জাপানি মুভমেন্ট যারা চালাত তারা ব্যবসায়ীদের প্রথমে বলত, জাপানি মাল এনে মুনাফা করবেন না। অনুরোধে যখন কাজ হতো না তখন দরকার হতো ডান্ডার। হ্যান্ডগ্রেনেডরূপী ডান্ডা বেশ কাজ

করত।

তবে চিনের অবস্থার সঙ্গে আমাদের দেশের নিকট-সম্বন্ধ নেই এবং ছিলও না। যাঁরা বলেন চিনের সঙ্গে আমাদের নিকট-সম্বন্ধ, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের দেশে জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতা থাকায় একের মৃত্যুতে অন্যে সুখী, একের জাহান্নামে পৌঁছনোর ঘটনায় অন্যে করতালি দেয়। এখানে কথাটি সংক্ষেপে সমাপ্ত করতে বাধ্য হলাম। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব।

অসমিয়ারা যখন দলে দলে কারাবরণ করছিল তখন বাঙালি এবং অসমিয়া মুসলিমদের একেবারে নির্বাক থাকতে দেখেছি। বাঙালি এবং অসমিয়া সরকারি কর্মচারীরা অসমিয়া গান্ধীবাদীদের দুর্দশা দেখে তৃপ্ত হতো, এও বেশে বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের দেশে শুধু সাম্প্রদায়িকতা অথবা জাতিভেদের কালো ছায়া মানুষের মন বিষাক্ত করছে না, আমাদের দেশের ধনীরা পৃথিবীতে যত ধনী আছে তাদের সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট মনোভাবাপন্ন। জন্মান্তরবাদই তার প্রধান কারণ।

এদিকে পাটনি শ্রেণির লোকের সংখ্যা বেশি। পাটনিরা মিশ্রিত জাতি। ব্রাউন এবং পীত জাতির সংমিশ্রণে এদের বেশ নৃতনত্ব হয়েছে। ক্রমেই পীতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ব্রাউন যদি পুরুষ হয়, স্ত্রীলোকটি হয় পীত, তাহলে ছেলেমেয়ে সবই পীত হয়। আবার পীত যদি বাবা হয় এবং মা হয় ব্রাউন, তবুও ছেলেমেয়ে সবই পীত হয় দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে অসমে ক্রমেই পীতবর্ণের লোকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ভবিষ্যতে বাদামি রঙের লোক অসম এবং বাংলাদেশের কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে না। পাটনিরা বড়ই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং অতিথিপরায়ণ। আমরা ইচ্ছে করেই এক পাটনির গৃহে অতিথি হয়েছিলাম। এদের ঘর সবসময় নিকানো-পুছানো থাকে। থালা ঘটিবাটি ঝকঝক করে। দুঃখের বিষয়, এরাও আমাদের মতোই জল ফুটিয়ে খায় না। তার ফলে মাঝে মাঝে গ্রামকে গ্রাম কলেরায় আক্রান্ত হয়ে নির্বংশ হয়। পথে অনেক নির্বংশ গ্রাম দেখতে পেয়েছিলাম। পাটনির বাড়ি থেকেই আমরা শিলঘাটে পৌঁছই। আমাদের গন্তব্যস্থল তেজপুর।

৩

ওপারে দাঁড়াতে হয়েছিল অনেকক্ষণ। সামনে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ। নদের জল গভীর। অনেকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। আমি নদের জলের দিকে চেয়ে ছিলাম। নদের স্রোত দেখে একবারও মনে হয়নি যে এখানেও বান ডাকতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে নদের গভীরতা সমুদ্র-তল (sea-level) থেকেও নীচে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নদীর জল যে কেমন করে বিপরীত দিকে যেতে বাধ্য হয় এই তথ্যই বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। চিন্তায় বাধা পড়ল। পাটনি ডাক দিয়ে বলল, "চলো কে কে ওপারে যাবে?"

আমরা সাইকেল-সমতে নৌকোয় উঠলাম। অনেক লোক উঠল। নৌকো বোঝাই হয়ে গেল। অনেকে ভীত হয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করল। শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি ঈশ্বরের নাম নিলে না কেন?" শৈলেন বলল, "আমি তো কাপুরুষ নই। নৌকো যদি ডুবে যায় সাঁতরাবার চেষ্টা করব, হয়তো ওপারেও যেতে পারব।"

আমরা ওপারে পৌঁছলাম। নৌকোয় উঠেছিলাম সকলের আগে, নামতে হলো সকলের শেষে। নৌকো থেকে নেমেই নদীতীর দিয়ে যে বড় রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে সেই পথে চললাম। কতক্ষণ যাওয়ার পর একটি হোটেল পেলাম। বেশ ভালো হোটেল। থাকবার জন্য কিছুই দিতে হতো না। চার আনা করে প্রত্যেক বারের খাবারের দাম দিতে হতো।

হোটেলের ম্যানেজার দুখানা চৌকি দেখিয়ে দিলেন। আমরা আমাদের মামুলি বিছানা পেতে স্নান করে এলাম। উত্তম খাদ্য বলতেই হবে। বিকেলে শহর বেড়াতে বের হলাম। শহরটা দেখে মনে আনন্দ হলো। একেবারেই অস্থায়ী শহর। একখানাও ইটের বাড়ি দেখতে পেলাম না। নদীর ভাঙনের ভয়ে ভীত হয়ে কেউ পাকা বাড়ি তৈরি করে না। বাঁশ, বেত আর উলু ছন এই তিনটি জিনিস দিয়ে শহরের বাড়িঘর তৈরি। সজীবতা সর্বত্র লক্ষ করা যাচ্ছিল। উকিল, ডাক্তার, মোক্তার, কেরানি এঁরাই ছিলেন বেশ মোটা উপার্জনকারী, তারপর ব্যবসায়ীরা। এখানেও মধ্যবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অনেক উন্নত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ব্যবসায়ের একচেটিয়া আধিপত্য অর্জন করেছিল জয়পুরিরা। দেখে মনে হয় না যে তারা ধনী, অথবা ভেতরে ভেতরে এতদূর এগিয়ে গেছে।

আমাদের যিনি অভ্যর্থনা করলেন তিনি একজন জয়পুরের বাসিন্দা। কিন্তু বাঙালি অথবা অসমিয়া হয়ে গেছে বললে দোষ হয় না। তাঁর বিরাট শরীরই বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে তিনি ভিন্ন প্রদেশ থেকে এখানে একজন নবাগত মাত্র। তিনি ইংরেজি বেশ ভালো

জানতেন। কথাপ্রসঙ্গে চিনের কথা উঠল। চিনের অবস্থা জানবার জন্য উৎসুক হলেন। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি এবং অসমিয়াদের সঙ্গে সুপরিচিত হবার সুযোগ হয়ে গেল। লক্ষ করেছিলাম, এখানে যাঁরা স্বদেশী করতেন তাঁরা একেবারে আনাড়ি, বিদেশের সংবাদ মোটেই রাখতেন না। 'ব্রিটিশকে তাড়াও' শুধু এই পর্যন্তই জানতেন। এর বেশি ওঁদের চিন্তা করবারও ছিল না। কিন্তু কেমন করে তাড়াতে হবে, তাড়াতে যদি পারা যায় কেমন করে ভবিষ্যতে দেশের এবং দশের উন্নতি করতে হবে, তার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। শুধু 'তাড়াও আর তাড়াও!'

এখানে অনেক খুলনাবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের অধিকাংশ আই.বি. বিভাগের লোক। এবং যে-পদ্ধতিতে এঁরা কাজ করে যাচ্ছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল, তেজপুরের শাসনভার যেন তাঁদেরই উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁরা সর্বদাই সকলের সঙ্গে কথা বলার জন্য উৎসাহী অথচ কথার ফাঁকে কিছু গোপন তথ্য জানা যায় কি না এটাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। অসমিয়া-বাঙালি পার্থক্য এখানে পূর্বে ছিল না। কিন্তু আই.বি. মহাশয়েরা বাঙালি-সমাজকে অসমিয়া-সমাজ থেকে পৃথক করে ফেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। কলকাতায় পৌঁছেও দেখেছিলাম আচার্য পি. সি. রায়ের মতো লোকও পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার প্রাধান্যকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করতেন কিন্তু তাঁর আশেপাশে কতকগুলি 'ফেউ' থাকত, তারাই তাঁর পবিত্র মনে বিষের ইঞ্জেকশন দিয়ে দিত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তখনই তৈরি হয়েছিল। এইরকম প্রাদেশিকতা-যে ব্রিটিশের রাজনৈতিক চাল তা কেউ বুঝত না, বোঝবার চেষ্টাও করত না।

দ্বিতীয় দিনই একটি লেকচার দিয়েছিলাম। চিনের বিষয় উদ্ধৃত করে বলেছিলাম, "চিনের স্বাধীনতাকামী যুবক-যুবতীরা কিন্তু প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দিচ্ছে না, অথচ চিনের শয়তান প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাইশেক ব্রিটিশের অনুকরণে প্রাদেশিকতা ও বুদ্ধ-ইসলাম প্রভৃতি অনেক রকম সমস্যার সৃষ্টি করেছে।" তারপর বলে ফেললাম, "মুষ্টিমেয় কয়েকজন আই.বি. বিভাগের লোক কেমন সুন্দর করে প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করছে তা কি আপনারা লক্ষ করছেন না? আপনাদের মধ্যে যাঁরা রাজনীতি করছেন তাঁরা স্বদেশ এবং বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবেন। আপনারা সংবাদ পান শুধু রয়টারের মারফত, রয়টার-যে আমাদের কত সংবাদ থেকে বঞ্চিত করছে সে-খবর আপনারা রাখেন কি?"

এই লেকচারের পরই আমার প্রতি আই.বি. বিভাগের খরদৃষ্টি পড়ল। তাতে একটুও দুঃখিত হলাম না। আবার বিদেশে যেতে পারবই তা-ই ছিল আমার ধারণা।

বিকেলে লেকচার দিয়েছিলাম। লেকচার দেবার পরই বুঝতে পেরেছিলাম, এখানে আরো কয়েকদিন থাকা খারাপ হবে। লেকচার থেকে ফিরে এসে শৈলেনকে যখন সকল কথা বুঝিয়ে বললাম তখন শৈলেন বলল, "প্রকাশ্যে এই ধরনের লেকচার দেবেন না। আমি যাদের নিয়ে আসব তাদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলবেন। এ ছাড়া ভূত-প্রেত ডাকাত-সাপ এবং বাঘের কথাই বেশি বলবেন। দেখবেন তাতেই লোক সন্তুষ্ট হবে।"

শৈলেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি এখানে কাউকে চেন কি?"

"নিশ্চয়, দুই-একজনকে চিনি বই-কি এবং আপনি যেখানে যাবেন সর্বত্রই আমি কিছু লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, তাদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবেন।" শৈলেনের কেরামতি ছিল বলতেই হবে।

তেজপুরে ছিলাম চারদিন। চারদিনের মধ্যে চারজন মুসলমানের সঙ্গেও দেখা করতে সক্ষম হইনি। অথচ মাঞ্চুরিয়া, সাংটাং, কোয়াংটাং প্রভৃতি চিনের বড় বড় প্রদেশে চিনা মুসলমানদের সঙ্গে রোজই কথা বলতাম। তাদের উন্নত চিন্তাধারার প্রশংসা করতাম। আর নিজের দেশের নিজের জাতির মুসলমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না-হওয়ায় অন্তরে কত ব্যথা পেয়েছিলাম তা বলবার নয়।

পঞ্চম দিন সকালে আবার নদীতীরে এলাম। আমার সঙ্গে যারা এসেছিল তারা ছিল আই.বি. বিভাগের লোক। তারা দেখতে এসেছিল, আমি শহর ছাড়লাম কি না। নদীতীরের আকাশ ছিল শুদ্ধ মুক্ত, বাতাস বইছিল মৃদু মৃদু। বেশ আরাম লাগছিল। কিন্তু পাশে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা ছিল ত্রিশ টাকার গোলাম। ত্রিশ টাকায় মানুষের মনের গতি এত পঙ্কিল কী করে হতে পারে তা-ই ভাবছিলাম।

সিংগাপুরে যখন ছিলাম তখন মনে পড়ে গৌরীশ একদিন বলেছিল, "মনে রাখবেন বিশ্বাস মশায়, আমাদের মধ্যে এখনও রয়ে গেছে কাল্পনিক মধ্যবিত্ত অহংকার। সেইজন্যই আমরা পরিশ্রমসাধ্য কাজ যারা করে তাদের ঘৃণা করি।"

গৌরীশদের বাড়ির কাছে ছিল অনেকগুলি কৃষক। তারা শুধু পানের চাষই করত এবং পান বিক্রি করে বিত্তশালীও হতে পেরেছিল। গৌরীশ তাদের ঘৃণা করত, সেই ঘৃণা তখনও তার মনে ছিল। সেই ঘৃণাকে অপসারণ করবার জন্য সিংগাপুরে থাকার সময়ে গৌরীশ কাজ নিয়েছিল ডকের মজুরি। মাত্র সাড়ে সাত আনা মজুরিতে আট ঘণ্টা কাজ করত। আমাদের দেশে এখনও যারা কাল্পনিক মধ্যবিত্তসম্পন্ন মনোবৃত্তি বজায় রাখছে তারা যদি কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দেবার ইচ্ছা রাখে তাহলে তাদের প্রথম কাজ হবে — হয় কৃষকের দলে, নয়তো মজুরের দলে মিশে মজুরি করা, তারপর রাজনৈতিক কাজে অগ্রসর হওয়া। তা না-হলে রাজনৈতিক বুদ্ধি অর্জন করা অসম্ভব। আবার বলছি, নিশ্চয়ই অসম্ভব।

নদীর ওপারে এসে নগাঁওয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। পথ বড়ই সুন্দর। নদীতীর দিয়ে আমরা চলছিলাম। নদীর স্নিগ্ধ বাতাস আর দুই দিকের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মোহিত করে ফেলেছিল। কবি-কবি ভাব হয়েছিল। কিন্তু কবিতা লেখার যেমন কল্পনাও করতাম না তেমনই কবিদের কবি-কবি ভাবও পছন্দ করতাম না। আসল কথা হলো, সাইকেলের ফ্রি-হুইল আপনি ঘুরছিল, আমরা চলছিলাম নীচের দিকে। পথে অনেকবারই নদী পার হতে হয়েছিল। কোথাও বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হয়নি।

এদিকে অসমিয়াদের মধ্যে আফিং-এর প্রচলন বেশি, সেইজন্য আরো নিরাপদ ছিলাম। আফিং যারা খায় তারা প্রাণান্তেও রাজদ্রোহ করে না। আফিং পেলেই হলো। অসমের যেসব অসমিয়া আফিং খেত তারা চিনাদের মতো শুধু আফিংই খেত না, সেইসঙ্গে ভাগ্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করত।

চিনারা ভাগ্য মানত না বলেই স্বাধীন হতে পেরেছে। আমাদের দেশের 'ভাগ্য' চিনদেশের আফিঙের চেয়েও মারাত্মক এবং হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন। অসমিয়াদের মধ্যে দুই রকমের আফিং প্রচলিত দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম।

নগাঁওয়ে পৌঁছে আমরা আর-একজন অসমিয়া কংগ্রেসসেবীর বাড়িতে উঠেছিলাম। ভদ্রলোক বাস্তবিকই ভদ্র। তাঁর বাড়ির আশেপাশে যেসব বাঙালি ছিলেন তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু অসমিয়াদের আচার-ব্যবহারের দিকে লক্ষ রেখেছিলাম। অসমিয়াদের খাদ্যপ্রণালি ক্রমেই বাঙালি প্রথায় পরিণত হচ্ছিল। আসলে তাদের খাদ্যপ্রথা-যে থাইপ্রথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তা বুঝতে পেরেছিলাম। থাইদের ভাত রান্না করাই সবচেয়ে বড় কাজ। ভাত রান্না হয়ে গেলে তরকারির জন্য চিন্তা করতে হয় না। ভোজনের ব্যাপারে আমাদের চিন্তাধারা একেবারে বিপরীত। আমরা ভাতের সঙ্গে কী খাব চিন্তা করি বেশি। এটা কিন্তু খারাপ নয়। মানুষ যতই উন্নতি লাভ করছে ততই প্রধান খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে উপকরণ-খাদ্যের ওপর নির্ভর করছে বেশি। দুঃখের বিষয়, যেভাবে আমরা উপকরণ-খাদ্যের ওপর ঝুঁকে পড়েছি, সেই রকমে কিন্তু আমরা উনুন গঠনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি না। এখনও আমরা প্রিমিটিভ প্রথামতোই উনুন রেখেছি। এটা আমাদের সামাজিক প্রথার চরম দুর্গতি বলতেই হবে।

নগাঁওয়ের অবস্থিতি এবং আবহাওয়া চমৎকার। এখানে ইউরোপিয়ান প্রথায় বাড়িঘর তৈরি করে আনন্দের সঙ্গে বসবাস করা যেতে পারে।

তিনদিন নগাঁওয়ে বাস করে চতুর্থ দিন আমরা কামরূপের কামাখ্যা দেবীর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। পথে অনেকগুলি অসমিয়া মুসলিমের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা অনেকেই তাঁদের বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন, কিন্তু সেইদিনই আমরা কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখতে যাব শুনতে পেয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, হিন্দু প্রথায় যে-ছুঁতমার্গ আছে, অথবা অন্যান্য যেসব কুসংস্কার আছে, আমার মন থেকে তা দূর হয়নি। শুধু তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য যাঁরাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে ভাত এবং চা খেয়ে খুশি করেছিলাম।

কামাখ্যা দেবীর বাড়ির পাশ দিয়ে আসাম ট্রাংক রোড গুয়াহাটির দিকে চলে গেছে। আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে সাইকেল ইত্যাদি রেখে কামাখ্যা দেবীর মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দির নূতন। মিরজুমলা এই মন্দির ভেঙেছিলেন। রাজা শিব সেই মন্দির পুনর্গঠন করেন। মন্দিরের কোথাও কোনো প্রতিমা দেখতে পাইনি। একস্থানে একটি যোনি দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। গর্ভটাতে শ্বেত চন্দন দিয়ে ভরতি করে রাখা হয় এবং যখনই কোনো যাত্রী যায় তাকে একখানা শ্বেত চন্দনের টুকরো দেওয়া হয়। পুরোহিত ঠাকুর সেইজন্য এক টাকা সোয়া পাঁচ আনা দাবি করেন। সকলেই তাঁর দাবি রক্ষা করে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আশীর্বাদস্বরূপ ন্যাকড়া ফেলে দিলাম। শৈলেন জিজ্ঞাসা করল, "ফেলে দিলেন কেন ন্যাকড়াটা?"

তাকে কিছুই বললাম না। পৃথিবীর সর্বত্র লিঙ্গপূজার প্রচলন

আছে, শুধু অসমের থাই-শ্রেণির লোক এখনও যোনির পূজা করে। আর কিছু না-হোক, মাতৃজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা যেমন ছিল এখনও তেমনই রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে যদি ঈশ্বরের নাম করে লিঙ্গ উপাসনা করা যেতে পারে তাহলে মাতৃজাতির উপাসনা কামাখ্যা মন্দিরেও করা যেতে পারে। উভয় পূজাই কিন্তু একই চিন্তাধারা থেকে উৎপন্ন। অতএব মহম্মদ, জিশু, শংকর এঁদের মধ্যে চিন্তাধারা বেশি উন্নতি লাভ করেনি। বরং বুদ্ধ এবং কনফুসিয়াস পিতৃপূজা অথবা মাতৃপূজার কোনোরূপ প্রস্তাবনা দেননি, তাঁরা বলেছেন মানুষের সেবা করতে। এর মধ্যে কনফুসিয়াস যদিও কারো পূজার আদেশ দেননি তবুও মাতৃজাতির প্রতি তাঁর অনেক অবিচার দেখা যায়। সেই হিসাবে জিশু খ্রিষ্ট বড়ই উদারতা দেখিয়েছেন। তাঁর উপদেশাবলি অনেকটা থাইদের ধর্মীয় নিয়মকানুনের সঙ্গে মিলে যায়। অবশ্য মহম্মদ, জিশু এবং শংকর জন্মান্তরবাদের যেসব কথা বলেছেন, থাইরা সেরূপ কিছু বলেন না। সেদিক দিয়ে কামাখ্যা মন্দিরের পেছনে যে-চিন্তাধারা তা প্রিমিটিভ চিন্তাধারা থেকে অনেক উন্নত। দুনিয়ার মানুষ ক্রমেই উন্নতি লাভ করছে এবং ভবিষ্যতে আরো করবে। তখন আদি যুগের জন্মান্তরবাদ, বেহেস্ত, দোজ়খ এসব হবে হাস্যকর বিষয় এবং সেজন্যই এই বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

সেইদিন সন্ধ্যার পূর্বে আমরা গুয়াহাটি পৌঁছই এবং একটি বাঙালি হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করি। দুদিন পরেই দেখা হয় বরুয়ার সঙ্গে। তিনি ছিলেন গুয়াহাটির আইন কলেজের প্রিন্সিপাল। একজন শিক্ষিত লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে কত-যে আনন্দিত হয়েছিলাম তার আর অবধি নেই। তিনি আরো কয়েকজন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে গোস্বামী এবং শর্মাই প্রধান।

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের কথাই প্রথম সমালোচনা করা হয়, সেইসঙ্গে হয় মাতৃপূজার কথা। পৃথিবীর সর্বত্র মাতৃপূজা হতো শর্মা প্রমাণ করে দিলেন, তারপর আরম্ভ হয়েছিল পশুপতির পূজা — আমার অবশ্য ধারণা, আমাদের দেশেও তা-ই হয়েছিল। মা ও মাতৃস্নেহ এই দুটোর মধ্যে নিশ্চয়ই মা প্রথম, তারপর মাতৃস্নেহ। যে-মায়ের মাতৃস্নেহ নেই সেই মায়ের সন্তান বাঁচতে পারে না। মাতৃস্নেহবিহীন অনেক মা দেখা যায়। আমরা সেরূপ মায়েদের দেখতে পাই সামাজিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। সজল নয়নে মা সন্তানকে ডাস্টবিনে ফেলে যেতে বাধ্য হন। এটা হলো সভ্য সমাজের কথা। অসভ্যদের মধ্যে এখনও কিছুটা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলছি, আরব দেশের জিপসিদের কথা।

যখনই কোনো আরব কোনো জিপসি মেয়েকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে করে তখনই তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। প্রথমত, জিপসি মা তার সন্তানকে বাঁচতে দেয় না। দ্বিতীয়ত, স্বামীকেও হত্যা করার সুযোগ পেলে সে হত্যা করে। এটাও প্রায় সভ্য সমাজেরই বিষয় বলা যেতে পারে। কিন্তু যারা একেবারে অসভ্য তাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ করলে দেখা যায়, কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে হঠাৎ সহবাস করার ফলে যদি কোনো সন্তানের জন্ম হয় এবং সেই পুরুষের প্রতি যদি স্ত্রীলোকের ঘৃণা থাকে, তাহলে সেই শিশুকে খেতে না-দিয়ে মা মেরে ফেলে। যাকে ঘৃণা করা হয় তার ঔরসজাত সন্তানের বাঁচবার অধিকার অসভ্য মা ছিনিয়ে নেয়। এই প্রকারের শিশুহত্যা থেকে মায়েদের নিবৃত্ত করবার জন্য পূর্বকালে মাতৃপূজার ব্যবস্থা ছিল। পরে ধীরে ধীরে যখন মায়েরা স্বামীর অধীনতা স্বীকার করতে থাকল তখন পুরুষ-দেবতার সৃষ্টি হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পশুপতিনাথ শিবলিঙ্গ ইত্যাদি। তবে শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে আমার এখনও সন্দেহ আছে। মায়েরা হয়তো মাতৃপূজার পূর্বেই শিবলিঙ্গের আরাধনা কল্পনাবলে করতেন। কল্পনা করার কী দরকার ছিল? পুরুষ কি তখন ছিল না? নারী কি প্রকৃতির প্রথম অবদান? পুরুষ ছাড়া কি কোনো প্রাণীর জন্ম হতে পারে? এই প্রকারের আলোচনায় দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল।

গুয়াহাটিতে শুধু বাঙালি আই.বি. বিভাগই প্রাদেশিকতার বীজ ছড়াচ্ছিল না, অসমিয়া মুসলিমও যোগ দিয়েছিল। সাইদুল্লার প্রথম নম্বরের কেন্দ্র ছিল গুয়াহাটিতে। অসমিয়া মুসলিমরা বড়ই সুন্দরভাবে প্রাদেশিকতার বীজ ছড়াচ্ছিল। তারা বেশি কথা বলত না। প্রায় সব কথার শেষেই বাঙালিদের বিরুদ্ধে দু-একটি কথা বলত। আমার প্রিয় বন্ধু গোস্বামী মহাশয় পানবাজারে থাকতেন। অতি আগ্রহ করে তিনি কয়েকজন অসমিয়া মুসলিমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আমাকে নিয়ে যান। বেশ আরামদায়ক কথা চলছিল, হঠাৎ একজনের মুখ থেকে বের হয়ে পড়ল, "সবই ভালো, কিন্তু এ যে আসলি বাঙালি, শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের বাসিন্দা।"

শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ সাবডিভিশনের দু-দিকে ময়মনসিংহ জেলা, আর একদিকে ত্রিপুরা জেলা। কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে এই

দুই জেলার সঙ্গে হবিগঞ্জবাসীর নিকট-সম্বন্ধ। গোস্বামী মহাশয় কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে অন্য কথা আরম্ভ করলেন। এই প্রকারের প্রাদেশিকতার বিষ ব্রিটিশ সরকার নানা রকমের এজেন্সির মারফত ছড়াচ্ছিল।

প্রাদেশিকতার বিষে অনেক নরনারী আক্রান্ত হয়েছিল। তারাও কিন্তু স্বদেশী, অথচ তারা কখনো তলিয়ে দেখত না যে স্বাধীনতা পাবার জন্য যাঁরা চেষ্টা করছিলেন তাঁরা কী চান এবং কেনই-বা অকাতরে কারাবরণ, নির্যাতন বা ফাঁসি বরণ করে নিচ্ছেন! বাস্তবিক পক্ষে স্থানীয় বিষয় এবং পরিবেশের দিকে মোটেই কারো দৃষ্টি ছিল না।

এর পেছনে ছিল না কৃষক, এর পেছনে ছিল না মজুর। তখনও 'চাষাটা, মজুরটা' এই প্রকার কথারই ছিল রেওয়াজ। আমি আর পারলাম না সহ্য করতে, মন একেবারে পরিবর্তন করে ফেলে নূতন করে নিজের দেশ দেখতে প্রবৃত্ত হলাম। সোভিয়েত রুশিয়ার সংবাদ অনেকেই মামুলিভাবে শুনেছিলেন, কিন্তু কিছুই বিশ্বাস করতেন না। 'ভাগ্য' ও 'ভগবান' এ-দুটো যেন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে চেপে বসেছিল! বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করবার মতো শক্তি কারো ছিল না।

গুয়াহাটি ছাড়বার সময় হয়ে গেল। আমরা গুয়াহাটি ছেড়ে কেরানিগঞ্জের দিকে রওনা হলাম। শিলঙের অপর নাম কেরানিগঞ্জ, যে-শহরে আমার স্বজেলাবাসী তখন প্রবল বিক্রমে রাজত্ব করছিলেন। একদিনেই আমরা শিলং পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম। চিন্তার বিষয় ছিল, থাকি কোথায়? হোটেলে থাকার মতো টাকা ছিল না। আমার স্বজেলাবাসী কেরানি মহাশয়েরা বড়ই গোঁড়া। তাঁরা আমাকে তাঁদের বাড়িতে থাকতে দেবেন না, তার একমাত্র কারণ, আমার জাত ছিল না। অনেক ভেবেচিন্তে শেষটায় আমার বন্ধু কেতকী দেবের আশ্রমে উঠলাম।

কেতকী রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়ে স্বামী হয়েছিল। সে জাতের বিচার করত না। যদিও তার জাতের বিচার ছিল না তবুও তার মন থেকে কুসংস্কার যায়নি। সে জানিয়ে দিল যে আমাকে রান্না করতে হবে। আমি রাজি হলাম না। তাকে আমিও জানিয়ে দিলাম, ভ্রমণ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত রান্না করে খাব না। অবশেষে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-হেটেলে খাওয়ার বন্দোবস্ত হলো এবং থাকলাম তারই আশ্রমে।

শৈলেন ছিল আমারই মতো ধর্ম-বিবর্জিত। রেঙ্গুনে তার জন্ম। ছুঁতমার্গ কী চিজ বুঝতই না। সে যে কায়স্থ, সেই পর্যন্তই তার জানা ছিল। শৈলেন খেত সবই। শূকর-মাংস ছিল তার প্রিয় খাদ্য। শিলঙে খাসি জাতি শূকর-মাংস খায়। মাঝে মাঝে সে খাসিদের বাড়িতে খেয়ে আসত। আমার নিকটস্থ আত্মীয়েরা একটু দূরে সরে থাকতেন, কী জানি তাঁদের বাসায় যদি ঢুকে যাই! তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করে কারো বাসায় যেতাম না।

কেরানিগঞ্জের পরিচালক সাইদুল্লা। সাইদুল্লা কিন্তু আমাকে সাদরেই গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য মন্ত্রীও আদর-আপ্যায়ন করতে কসুর করেননি। শিলঙে থাকার সময়ে কয়েকটি লেকচার দিতে হয়েছিল। চিন, জাপান, কোরিয়া, ইন্দোচিন, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়বাসীদের আচার-ব্যবহার নিয়েই বক্তব্য বিষয় সমাপ্ত করতাম। যখনই বলতাম, এই কারণে চিনারা এই করতে বাধ্য হয়েছে তখনই বুঝতাম, আমার দেশবাসী আসল তথ্য জানতে মোটেই রাজি নন, শুধু বাইরের ভাসা-ভাসা কথাতেই তাঁরা তৃপ্ত। ❑

এ-যাবৎ প্রদত্ত স্মারক বক্তৃতার বিবরণ

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

বছর	বক্তা	বিষয়
২০১১	হরেকৃষ্ণ ডেকা	আধুনিক অসমিয়া কবিতার বিবর্তন
২০১২	বীরেন্দ্রনাথ দত্ত	অসমিয়া লোকগীতের বৈচিত্র্যের পটভূমিতে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব : এক ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, লোক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিপাত
২০১৩	অমলেন্দু চক্রবর্তী	সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান
২০১৪	প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য	বোড়ো কবিতার ক্রমবিকাশ
২০১৫	শিবনাথ বর্মন	বেজবরুয়ার জাতীয়তাবোধ : ইয়ার বঙ্গীয় পৃষ্ঠভূমি
২০১৬	প্রসেনজিৎ চৌধুরী	অন্য এক জ্যোতিপ্রসাদ
২০১৭	নগেন শইকীয়া	অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

বছর	বক্তা	বিষয়
২০১১	তরুণ মুখোপাধ্যায়	আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন
২০১২	বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য	উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা
২০১৩	সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়	বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল
২০১৪	বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	আধুনিক বাংলা কবিতায় উপমা, রূপকল্প ও চিত্রকল্প
২০১৫	সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়	স্বামী চণ্ডিকানন্দ ও তাঁর সংগীত সাধনা
২০১৬	সুমিতা চক্রবর্তী	বাংলা গদ্যের বিবর্তন ঃ সার্ধশতবর্ষ
২০১৭	তরুণ মুখোপাধ্যায়	বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর

এবার সহ গত কয়েক বছর রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ উন্মোচনকারী গুণীগণ :

সাল	উন্মোচক
২০১১	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি হীরেন ভট্টাচার্য
২০১২	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ও সমালোচক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২০১৩	বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ও সমালোচক ভবেন বরুয়া
২০১৪	বিশিষ্ট অসমিয়া বুদ্ধিজীবী ও 'দৈনিক জনসাধারণ' পত্রিকার সম্পাদক শিবনাথ বর্মন
২০১৫	অসমিয়া কবি তথা শিশুসাহিত্যের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীমতী তোষপ্রভা কলিতা
২০১৬	অসমিয়া ও বাংলা ভাষার সুপরিচিত লেখক শ্রীমতী অণিমা গুহ
২০১৭	সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক শ্রীমতী নিরুপমা বরগোহাঞি
২০১৮	বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাব্রতী শ্রীমতী মুক্তি চৌধুরী

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

অজিৎ বরুয়া

গত শতকের চল্লিশের দশকে আধুনিক অসমিয়া কবিতার জগতে মুষ্টিমেয় যে-কয়েকজন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অজিৎ বরুয়া তাঁদের অন্যতম।

প্রয়াত চিত্রমল্ল ও পদ্মলতা বরুয়ার পুত্র অজিৎ-এর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯২৬ সালের ১৯ আগস্ট। কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অসমে তৃতীয় স্থান লাভ করে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে কটন কলেজ থেকেই ইংরেজি অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতার বার্তা বহনকারী অজিৎ বরুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে রয়েছে 'তীখা', 'হাতুরী', 'মন-কুঁঅলী সময়', 'দুখর কবিতা', 'কিছুমান ব্রোঞ্জর ঢেকীয়া', 'এযোর তামর অর্ঘা', 'চেনর পারত' ইত্যাদি; অতঃপর 'জেংরাই ১৯৬৩' সহ 'ব্রহ্মপুত্র', 'শব্দ-সংবেদ্য', 'স্বর্ণচম্পা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসম্ভার। চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত কবিতার সঙ্গে তাঁর যে-দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতা, আধুনিক কবিতার প্রবক্তা টি. এস. এলিয়টের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও চর্চা, তৎসহ ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গেও সুপরিচিত হওয়ার মানসে কাব্যতত্ত্বের যে-নিরলস সাধনা তিনি করেছেন— সে-সবের জন্যই তাঁর কবি-পরিচিতি অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস) একজন নিষ্ঠাবান অফিসার হিসাবে অসম সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করে নামনি অসমের কমিশনার হিসাবে চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি ('কিছুমান পদ্য আরু গান', ১৯৮২)। পরবর্তী দুই দশকে, ১৯৮৩-২০০২ সময়কালে গান-কবিতা-অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাহিত্য-সমালোচনা ও প্রবন্ধের কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। অসমিয়া ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, ফরাসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মপুত্র, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি' এবং তিনিই গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ'-র প্রথম সংখ্যায় (১ জানুআরি ১৯৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এ-যাবৎ যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীবরুয়া তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৮), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) এবং অসম সরকার প্রদত্ত কবি গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)।

২০১৫ সালের ৩ এপ্রিল তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য গত চার দশক ধরেই একটি উজ্জ্বল নাম।

তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ঈশানচন্দ্র ও সুকুন্তলা ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সন্তান বিজিৎ-এর পড়াশোনা নিলামবাজারে বিপিনচন্দ্র হাইস্কুল, শিলঙে সেন্ট এডমান্ড্স কলেজ এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দির এস এস কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মজীবন শুরু। ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ২০০২ সালে।

সাহিত্যের প্রতি বিজিৎ-এর অনুরাগ কৈশোরকাল থেকেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'তরুণ' নামের এক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৫৪-৫৬), শিলঙে ছাত্রাবস্থায় সম্পাদনা করেন 'মুরজ', 'মৌসুমীরাগ' (১৯৬১-৬৩)। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে তাঁর সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। পত্রিকাটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখে এই অঞ্চলের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি সহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'দৃশ্যে নায়িকার অনুপস্থিতিতে' সেখানে মঞ্চস্থ হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৫ সালে।

বিজিৎ-এর প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা আট— ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেউ পরবাসী নয়', এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় 'জেগে আছে স্তব্ধতায়', 'সুন্দর যেখানে খেলা করে', 'মহাভারত কথা', 'পুনর্ভবা', 'ও ছেলে বাউল ছেলে', 'ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তাঁর সম্পাদিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৯৬৯) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের এক মলাটের মধ্যে স্থান দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অন্যান্য যে-সব গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ছয় খণ্ডের 'নির্বাচিত সাহিত্য'; 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা কাব্যচর্চা', 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বরাক উপত্যকার সঙ্গীতচর্চা' এবং 'বরাক উপত্যকায় চারুকলাচর্চা'। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বইগুলির নাম যথাক্রমে 'সুরক্ষিত বন্দিশালা', 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন', দুই খণ্ডে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যের সাতকাহন' এবং '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'। শ্রীভট্টাচার্যের স্মৃতিমূলক সুপাঠ্য রচনা 'বিকেলের আলো' প্রসাদগুণে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর আরও একটি স্মৃতিকথা 'দিনান্তের বৈঠক' এবং উপন্যাস 'পটভূমি' শিলচরের দুটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

বিজিৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার ১৯৯২', একই বছরে সেরা সম্পাদক হিসাবে 'অনির্বাণ' পুরস্কার, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক 'জীবনানন্দ শতবার্ষিকী পুরস্কার' (১৯৯৯) এবং 'রামকুমার নন্দী মজুমদার স্মৃতি পদক' (২০০২), গুয়াহাটিতে 'একা এবং কয়েকজন' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মান ও স্মারক' (২০০২) এবং কলকাতায় 'সাহিত্য-সেতু' পুরস্কার (২০০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

হীরেন ভট্টাচার্য

তিনি ছবি আঁকেন, গান লেখেন। তাঁর কবিতায়ও তাই অনায়াস চিত্রধর্মিতা, অন্তর্লীন সুরের প্রবাহ, যা নিছক গীতিময়তা নয়।

বর্তমানে সৃষ্টিশীল অসমিয়া কবিদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য প্রবীণতম হয়েও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর চেহারায় যেমন কোনো বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা তেমনই মানুষটিও খুবই সাদাসিধে। পোশাকে পারিপাট্যের বালাই নেই, যেমন-তেমন একটা ট্রাউজার ও হাফশার্ট হলেই তাঁর চলে যায়, কখনো-কখনো কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, শীতকালে সোয়েটারের সঙ্গে মাফলার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে হলে দু-চার মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-শিল্পী সহ সাধারণ মানুষের এতটাই আপনজন যে 'হিরুদা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

প্রয়াত তীর্থনাথ ও স্নেহলতা ভট্টাচার্যের পুত্র হীরেনের জন্ম উজান অসমের যোরহাটে, ১৯৩২ সালের ২৮ জুলাই। ছোটবেলা কেটেছে যোরহাট ছাড়াও ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও তেজপুরে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। কলেজ-জীবন সুশৃঙ্খল ছিল না, শেষে গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইতি।

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখায় যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-কর্মী। কিছুদিন এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিভিন্ন প্রেসে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। ছিলেন আকাশবাণীর গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত গীতিকার। সাম্যবাদী কবি হীরেনের রচনায় প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যেখানে মিশে থাকে মাটির গন্ধ এবং সেইসঙ্গে রোমান্টিকতাও।

তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা' প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে, যদিও লেখালিখির শুরু পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। অসমিয়ার মতোই বাংলা ভাষায়ও তিনি সমান দক্ষ। চারটি বাংলা কাব্য-সংকলন সহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার র'দ' (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১), 'শইচর পথার মানুহ' (১৯৯১), 'জোনাকি মন ও অন্যান্য' (বাংলা, ১৯৯১), 'মোর প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার বোকামাটি' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার দিকচৌ বাটেরে' (২০০০), 'সিপার পরা পাতালৈকে' (২০০৯), 'বৃষ্টি পড়ে অঝোরে' (বাংলা, ২০১১) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য তার মধ্যে রয়েছে 'বিভিন্ন দিনর কবিতা'র জন্য অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা'র জন্য ১৯৮৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত বিষ্ণু রাভা পুরস্কার, একই বছরে একই গ্রন্থের জন্য ভারতীয় বিদ্যা ভবন প্রদত্ত রাজাজি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ওই বইয়ের জন্যই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, 'শইচর পথার মানুহ'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), উক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত বাজালিনী পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) এবং অসম সরকার প্রদত্ত গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)। এ-ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থান-এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন সৌহার্দ্য সম্মান।

পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি গ্রহণের প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ৪ জুলাই (২০১২) তাঁর দেহাবসান ঘটে।

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট' থেকে 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরনোর পরই অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে। পরের বছরই, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'শবযাত্রা'— যা নিছক দীর্ঘকবিতা নয়, 'মহাকবিতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যেখানে আজও তিনি অনন্য।

রোহিণীকান্ত ও যোগমায়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পবিত্রের জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলায়, ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বালোই মাতৃবিয়োগ এবং মাসির স্নেহে বড় হয়ে ওঠা, তারপর দেশভাগের বলি হয়ে কলকাতায় ছিন্নমূল ও সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। কৈশোর থেকেই শুরু হয় চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। ছিল না কোনো স্থায়ী আস্তানাও। পড়াশোনা চালাতে হয় টিউশনি করে। কলেজে পড়ার সময়েই কাজ জোটে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে— প্রথমে লাইব্রেরিতে, পরে শিক্ষকতা। এম.এ. পাশ করার পর বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা।

ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশ করেন ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'কবিপত্র', এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অর্ধশতক অতিক্রম করেছেন। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে নিজেকে পালটেছেন, পরিবর্তিত হয়েছে রচনাভঙ্গি এবং তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে 'শবযাত্রা' ('ভাসান'-এ যার পরিসমাপ্তি) ছাড়াও আরও কয়েকটি মহাকবিতা— 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯, যেটি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'Iblish Confronts Himself' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লীলা রায়), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮২), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪), 'জতুগৃহে আছি' (২০০৯)। সনেট রচনায়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

আশির দশকে কবিতা নিয়ে শুরু করেন নতুন আন্দোলন— 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন', এল 'প্রয়োগবাদী কবিতা'। পবিত্রের নিজের কথায়— "পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে সহমর্মীর, দূরত্বের নয়।... আমাদের কবিতা পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন, এ-লেখাটা তাঁরই লেখার কথা, কীভাবে যেন অন্য কেউ লিখে ফেলেছে।" এভাবেই তিনি সমসাময়িক কবিদের চেয়ে হয়ে পড়েন স্বভাবত স্বতন্ত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' (১৯৮৫), 'আছি প্রেমে, বিষাদে, বিপ্লবে' (১৯৮৭), 'আরোগ্যভূমির দিকে' (১৯৯৪), 'বিষ নয়, উঠেছে অমৃত' (১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১), 'শোনো স্বপ্নভুক, শোনো (২০০৫), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭), 'আগুনে সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০), 'সচেতন স্বপ্নচারী' (২০১১) প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ : 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবির দেশ, কবিতার দেশ' (২০০৯), আত্মজীবনীমূলক 'দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পবিত্র তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, শিলীন্ধ্র পুরস্কার, পদ্মাগঙ্গা পুরস্কার, ভারতচন্দ্র পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কার, তারাশংকর-বিভূতি পুরস্কার, চোখ পুরস্কার, আমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, 'কবিপত্র' সম্পাদনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্মান প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সম্মাননা।

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী নীলমণি ফুকন

অনেকের কাছে অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' হিসেবে তাঁর পরিচয়, তবে তিনি যে অসমিয়া কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন একজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক রূপেও।

কীর্তিনাথ ফুকন ও বরদাবালা দেবীর পুত্র নীলমণির জন্ম উজান অসমের দেরগাঁও-এ, ১৯৩৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। সেখানেই কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। দেরগাঁও হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে গুয়াহাটির আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান, সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ ১৯৯২ সালে।

নীলমণি শুধুই সমাজ-সচেতন কবি নন, দেশ ও রাজ্যের সমকালীন যাবতীয় বিষয় তাঁকে ভাবায়, ব্যক্তিগত অনুভূতিতে জারিত হয়ে উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর অনায়াস বৈদগ্ধ্যের পিছনে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অনলস অধ্যয়ন। তিনি যেমন খুবইকম লেখেন, তেমনই কবি হিসাবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ কিছুটা বিলম্বে। নীলমণির প্রথম কবিতা-সংকলন 'সূর্য হেনো নামি আহে এইনদীয়েদি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, রঙিয়ার 'প্রকাশন ঘর' থেকে। দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'নির্জনতার শব্দ' প্রকাশ পায় গুয়াহাটির বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'দত্ত বরুয়া' থেকে। এখন পর্যন্ত আটটি কাব্যগ্রন্থের জনক, যার মধ্যে রয়েছে 'আরু কি নৈঃশব্দ্য' (১৯৬৮), 'ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর ফালে' (১৯৭২), 'কাঁইট, গোলাপ আরু কাঁইট' (১৯৭৫), 'কবিতা' (১৯৮১), 'নৃত্যরতা পৃথিবী' (১৯৮৫) এবং 'অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলো' (২০০৩)।

তাঁর নির্বাচিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তিন : 'গোলাপী জামুর লগ্ন' (বাণী প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১৯৭৭), 'সাগরতলীর শঙ্খ' (ড. হীরেন গোহাঁই সম্পাদিত, লয়ার্স বুক স্টল, গুয়াহাটি, ১৯৯৪) এবং 'নীলমণি ফুকন : সম্পূর্ণ কবিতা' (অর্থাৎ, গুয়াহাটি, ২০০৬)। নীলমণির বাংলায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থও তিনটি : 'নির্বাচিত কবিতা : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক তড়িৎ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪), 'পড়োশি গোলাপ : নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রমানাথ ভট্টাচার্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৭) এবং 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রবীন্দ্র সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৭)। তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সিলেক্টেড পোয়েম্‌স : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক কৃষ্ণদুলাল বরুয়া, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি, ২০০৭), তা ছাড়া 'বিচিত্র লেখা', যা কয়েকটি নির্বাচিত গদ্য ও অনূদিত কবিতার সংকলন (বনফুল, ২০১০)। অসমিয়া ভাষায় লেখা তাঁর শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক বইগুলি হল 'লোক কল্পদৃষ্টি' (১৯৮৭), 'রূপ বর্ণ বাক্' (১৯৮৮), 'শিল্পকলা দর্শন' (১৯৯৮) এবং 'শিল্পকলার উপলব্ধি আরু আনন্দ' (অন্বেষা, ২০১২)। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটির নাম 'পাতি সোনারুর ফুল' (২০০৬)।

কবি হিসাবে ১৯৮২ সালে নীলমণি ম্যাসিডোনিয়ায় 'স্ট্রুগা পোয়েট্রি ইভনিং'-এ অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অসম সাহিত্য সভার 'রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার' (১৯৭২), কবিতার জন্য অসম প্রকাশন পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮১), 'লোক কল্পদৃষ্টি' গ্রন্থের জন্য জগদ্ধাত্রী হরমোহন পুরস্কার (১৯৮৮), অসম সাহিত্য সভার 'ছগনলাল জৈন পুরস্কার' (১৯৯১), কমলকুমারী ফাউন্ডেশন প্রদত্ত 'কমলকুমারী জাতীয় পুরস্কার' (১৯৯৪), উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত 'অসম উপত্যকা পুরস্কার' (১৯৯৮), ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০০), জোগুয়া ফাউন্ডেশনের 'জোগুয়া সাহিত্য পুরস্কারম' (হায়দরাবাদ, ২০০১), গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার (সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওড়িশা, ২০০২)। এ-ছাড়া পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন (১৯৯০), নয়াদিল্লির মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সম্মানিত সদস্য ছিলেন (১৯৯৯-২০০১) এবং ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির 'ফেলো'।

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

তরুণ সান্যাল

তরুণ সান্যাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহ বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকলেও কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাঁর কবিজীবন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতার সমবয়সি। কিশোরদের পত্রিকা 'রামধনু'-তে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ সালে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে। এবং আজও তাঁর সৃজনশীলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আইনজীবী পিতা অশ্বিনীকুমার সান্যাল ও হিরণময়ী দেবীর পুত্র তরুণের জন্ম পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় শাহাজাদপুর পরগনার পোরজনায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর (১২ কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে পোরজনা ছাড়াও বাঁকুড়া, রাজশাহি ও বর্ধমান জেলা এবং কলকাতায়। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৭ সালে কয়েক মাস উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনার পর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে যোগ দেন। সেখানেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৪ সালে সহাধ্যক্ষ হিসাবে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তরুণ সান্যাল সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুবাদে মাত্র দশ বছর বয়সেই বাঁকুড়ার এক মিছিলে যোগ দিয়ে কাঁদানে গ্যাসে আহত হন। শেষ-কৈশোরেই (১৯৪৯-৫০) নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলা কারাগারে অন্তরিন হন, পরেও একাধিক বার রাজবন্দি হয়েছেন। সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন ১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনেও। কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী তরুণ ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে যেমন প্রচারে নেমেছেন, তেমনই যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও, ওই অস্থির দিনগুলোতে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়দান ও জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার আহ্বায়ক এবং ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক (১৯৭২-৮১)। ১৯৮১ সালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্য ও চলচ্চিত্র সহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তরুণ সান্যালের প্রথম কবিতা-সংকলন 'মাটির বেহালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এখন পর্যন্ত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চব্বিশ। সাম্প্রতিকতম দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বাউকুড়ানির ব্রহ্মডাঙা' (২০০৯) এবং 'হাত ভরা ফুলের গল্প' (২০১০)। 'সর্বেশ্বরী শব্দেশ্বরী', 'মরিয়মের মীরা', 'অচিন পাখির একা', 'সন্ত্রাসে সংলাপে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন। তা ছাড়া রয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দে'জ, কলকাতা), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ঢাকা), 'কবিতা সংগ্রহ' দুই খণ্ড (দে'জ) এবং 'কবিতা সমগ্র' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড (দিয়া প্রকাশন)। তিনি মোট ৪২টি কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ৩৫টি গ্রন্থভুক্ত। তাঁর অনূদিত কবিতার বই তিনটি এবং চারটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আট।

যে-সব পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তরুণ যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'একতা' (১৯৫৫), 'কবিপত্র' (যুগ্মভাবে, ১৯৫৮), 'সীমান্ত' (১৯৬২-৬৭), 'পরিচয়' (যুগ্মভাবে, ১৯৬৭-৭৫), 'রুশ-ভারতী' (১৯৭২-৮১), এ-ছাড়া ২০০২ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

বাংলাভাষায় গত শতকের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি হিসাবে চিহ্নিত তরুণ সান্যাল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৭১), বিষ্ণু দে স্মারক সম্মান, রামমোহন সম্মান, বঙ্গবন্ধু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও প্রায় ২০টি সম্মান, ভারতভাষা ভূষণ সম্মান (১৯৯৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০০৬), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সম্মান (২০১২) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

২০১৭ সালের ২৮ আগস্ট তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১৩ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অসমিয়া কাব্যভুবনে নীলমণি ফুকনকে যদি বলা হয় অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' তাহলে অসমের 'বুদ্ধদেব বসু' হিসেবে নিশ্চয় পরিচিত হওয়া উচিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র হীরেন্দ্রনাথ সারাজীবন শিক্ষকতা করেছেন ঠিক বুদ্ধদেব বসুর মতোই। পাশাপাশি লিখেছেন কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা ও নিখাদ গদ্য। বস্তুত কাব্যজগতে এই কবি বেশ দেরিতে প্রবেশ করেছেন বলা যায়। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা'। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি যে-নিজস্বতার স্বাক্ষর রাখেন তা পরবর্তী কালেও অম্লান রয়েছে।

১৯৩৭ সালের পয়লা মার্চ যোরহাট জেলার তিতাবরে জন্ম হীরেন্দ্রনাথের। পড়াশোনা তিতাবর স্কুল থেকে গুয়াহাটির কটন কলেজ (ইংরেজিতে অনার্স) হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রসারিত। ১৯৫৯ সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার লেকচারার হিসেবে যোগ দেন, ১৯৮২-তে রিডার পদে উন্নীত হন এবং ২০০০ সালে কর্মজীবনের ইতি টানেন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকেই।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যগ্রন্থ তিনটি— 'সোমধিরির সোঁৱরণি আরু অন্যান্য কবিতা' (১৯৮১), 'মানুহ অনুকূলে' (২০০০) ও 'পল অনুপলর আঁচ' (২০০৭)। পাশাপাশি লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ ও আলোচনা। তাঁর আলোচনামূলক প্রবন্ধের সংকলন 'কিতাপর ভবিষ্যৎ' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। তাঁর প্রবন্ধের আরেকটি বই 'নির্বাচিত সমালোচনা'। ইংরেজি ভাষায় সম্পাদনা করেছেন প্রদীপ আচার্য অনূদিত 'ওআন হানড্রেড ইয়ার্স অব অ্যাসামিজ পোয়েট্রি'। অসম সরকারের প্রকাশনা পর্ষৎ প্রকাশিত এই গ্রন্থের বিশেষত্ব হীরেন্দ্রনাথ-লিখিত সুদীর্ঘ ভূমিকা।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মানুহ অনুকূলে'র জন্য ২০০৪ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অসমিয়া কবিতায় নিয়ে এসেছেন মেধা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের এক বিশেষ ঝলক। কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে শুধুই সংখ্যা দিয়ে নিজেকে সমকালীন রাখা নয়, হীরেন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন অনেকটা নির্জনে, একাকী। কম লেখেন, কিন্তু যা লেখেন সবই হয়ে ওঠে মন্ত্র। তাঁর ভাষা চিত্রধর্মী, কবিতায় অনেক সময় তিনি গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেন। প্রকৃতির কোল থেকে উঠে আসে তাঁর চিত্রকল্প, লোকগীতি বা রূপকথা থেকে উঠে আসে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি। সেইসঙ্গে রয়েছে সংগীতময়তার অভিব্যক্তি। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, বিষাদ-যন্ত্রণা তাঁর কবিতার প্রিয় বিষয়।

১৯৮৭ সালে হীরেন্দ্রনাথ ভূপালের ভারত ভবনে যোগ দেন 'কবি ভারতী কবিসম্মেলন'-এ। দু-বছর পর 'অসম সাহিত্য সভা'-র ডুমডুমা অধিবেশনের কবিসম্মেলনের তিনিই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি। অসমের বিখ্যাত সাময়িকপত্র 'গরীয়সী' ও 'প্রকাশ'-এ তাঁর বহু কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। শুধু অসমিয়া নয়, তাঁর শাণিত মেধা ঝরে পড়েছে ইংরেজিতেও। সাহিত্য অকাদেমির গুয়াহাটি, কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর বিভিন্ন কবিসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ।

২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুআরি তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

২০১৩ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী স্বপন সেনগুপ্ত

ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নীল আকাশ : পাখি' যখন প্রকাশিত হয় তখন ত্রিপুরার কবি স্বপন সেনগুপ্তের বয়স মাত্র একুশ বছর। কবিরা সাধারণত হাত পাকান লিট্‌ল ম্যাগাজিনে অথচ এই কবি লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লেখার আগেই নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করে ফেলেছেন। আর যখন তিনি লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'নান্দীমুখ' বের করলেন, অচিরেই সেটি হয়ে উঠল শুধু ত্রিপুরা বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট পত্রিকা।

কবি স্বপন সেনগুপ্তের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২ ডিসেম্বর। আগরতলার মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে সাহিত্য বিষয়ে লেখাপড়া। শেষপর্যন্ত সাহিত্য বিষয়েই পিএইচডি। ছাত্রজীবনেই কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি সম্পাদনা করেন নিজ কলেজের মুখপত্র 'প্রাচী'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দু-বছর পর তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নান্দীমুখ'। বাংলা ভাষার বহু উল্লেখযোগ্য কবি এই পত্রিকায় লিখেছেন। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ('এ আমার ভিখিরি হাত নয়') প্রকাশিত হয় দীর্ঘদিন পরে, ১৯৮৫ সালে। সে-বছরই আরেকটি কাব্যগ্রন্থ 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া'। এমন নয় যে এই কবি শুধু নিজের কাব্যভুবনেই আত্মমগ্ন। বরং তিনি খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়েছেন ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা লেখালিখির জগতের সঙ্গে। ১৯৭৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দ্বাদশ অশ্বারোহী', যেখানে রয়েছে ত্রিপুরার ১২ জন বিশিষ্ট কবির কবিতা। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার কবিদের কবিতা নিয়ে ১৯৮৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'গঙ্গা গোমতী'। একই সময়ে স্বপন সেনগুপ্ত কিন্তু নিজস্ব পত্রিকা 'নান্দীমুখ'ও সম্পাদনা করে চলেছেন। ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আরও দুটি গ্রন্থ—যথাক্রমে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' ও 'অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবিতা ও কাব্যালোচনা'।

বর্তমান শতকে প্রকাশিত স্বপনের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ হল 'ধুলোমাখা পিঁড়িতে একাকী', 'যুগলবন্দি তুফান', 'দহন ও জলস্তর', 'কবিতা সমগ্র-১' ও 'হারানো ঢেউয়ের জলপাই শিস'। তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। এ ছাড়া রয়েছে গদ্যগ্রন্থ 'স্বনির্বাচিত লেখালেখি' (২০০৬)।

স্বপন সেনগুপ্ত 'নান্দীমুখ' সম্পাদনা করেছেন ২৭ বছর। সম্পাদনা করেছেন ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পাক্ষিক পত্রিকা 'গোমতী'ও। কবি হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করলেও স্বপন সেনগুপ্তের গদ্যের হাতটি যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। বিভিন্ন সাময়িকী ও লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। 'বিশ্ববাংলা কবিতা সংকলন' ও 'পেঙ্গুইন বুকস্'-এর Dancing Earth কাব্য সংকলনে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন স্বপন তার মধ্যে রয়েছে সারা বাংলা কবি সম্মেলন থেকে সংবর্ধনা (১৯৭২), ত্রিপুরা সরকারের কবি সুকান্ত স্মৃতি পুরস্কার (২০০৬), রবীন্দ্র পরিষদ থেকে বিজনকৃষ্ণ সাহিত্য পুরস্কার (২০০৭), ত্রিপুরা সরকারের কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মন স্মৃতি পুরস্কার (২০১১) এবং ঢাকায় জাতীয় কবিতা পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রণ (২০১৩)।

২০১৪ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী ভবেন বরুয়া

শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্যিক ভবেন বরুয়ার জন্ম উজান অসমের শিবসাগর জেলায় যোরহাট মহকুমার অন্তর্গত জানজিতে, ১৯৩৯ সালের ১৬ ফেব্রুআরি। দেবেন্দ্রনাথ ও কাঞ্চনবালা বরুয়ার সন্তান ভবেনের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় গ্রামের স্কুলে, তবে ম্যাট্রিক পাশ করেন গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে, ১৯৫৬ সালে। যোরহাটের জগন্নাথ বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তিনি ইংরেজি অনার্স নিয়ে স্নাতক হন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েটে স্কলারশিপ পান ভবেন। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ভবেন বরুয়া অতিবাহিত করেছেন শিক্ষকতায়। যোরহাটে স্কুলের শিক্ষক হিসেবে যে-কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তার শেষ হয় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে। মাঝখানে তিনি পাতিয়ালার পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয় ও সিমলায় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি-তেও কাজ করেছেন, ছয়ের দশকে তিনবছর ছিলেন আকাশবাণী, দিল্লির অসমিয়া সংবাদপাঠক।

ইংরেজির শিক্ষকতা করলেও ভবেন বরুয়ার অসমিয়া ভাষায় ছন্দের হাত চমৎকার। 'সোনালী জাহাজ' কাব্যগ্রন্থের জন্য লাভ করেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। এই গ্রন্থটিই তাঁকে এনে দেয় আসাম পাবলিকেশন বোর্ড সাহিত্য সম্মান। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'নতুন পৃথিবী' (বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠকালে প্রকাশিত), 'সোনালী জাহাজ', 'পোদ্দরটা কবিতা', 'বগা জুই কলা জুই আরু অন্যান্য কবিতা', 'অসমিয়া কবিতা : রূপান্তরর পর্ব', 'অসমিয়া কবিতা : বিবর্তনর পর্ব', 'প্রসঙ্গ : কবিতা', 'প্রসঙ্গ : বাণীকান্ত', 'প্রসঙ্গ : জ্যোতিপ্রসাদ', 'প্রসঙ্গ : ভবেন্দ্রনাথ', 'অসমর বৌদ্ধিক দুরবস্থার প্রসঙ্গত', 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল কোয়েশ্চেন ইন নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়া', 'সায়েন্স, পোয়েট্রি অ্যান্ড পলিটিক্স'।

শিক্ষকতা ও সাহিত্য রচনার পাশাপাশি ভবেন বরুয়া বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে 'সংলাপ' (অসমিয়া), 'আসাম কোয়ার্টারলি' (ইংরেজি), 'জার্নাল অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব গৌহাটি : আর্টস' (ইংরেজি), 'সুদর্শন' (ইংরেজি), 'নতুন পর্যায়র সংলাপ' (অসমিয়া)।

অসম তথা ভারতে ভবেন বরুয়া বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গবেষক হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন সম্মেলন ও সভায় তিনি অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. সি. দেব শতবার্ষিকী বক্তৃতা, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেইন্ট শংকরদেব, ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য ফিলসফি অব বৈষ্ণবিজ্‌ম', প্রথম আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন স্মারক বক্তৃতা, অসম সাহিত্য সভা আয়োজিত প্রথম আনন্দরাম বরুয়া স্মারক বক্তৃতা, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. মহেন্দ্র বরা স্মারক বক্তৃতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো হিসেবে 'ফ্রম ইমিটেশন টু ইমাজিনেশন' প্রভৃতি।

এ-ছাড়া ২০০৫ সালে সিপাঝাড়ে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভার ৬৮তম অধিবেশনে কবিসম্মেলন উদ্‌বোধন করেন। পূর্ব ইউরোপে আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় কবি হিসেবে ভবেন বরুয়াকে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল সাহিত্য অকাদেমি। সেবার তিনি ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ঘুরে আসেন।

ভবেন বরুয়ার পত্নী দীপা ভারতীয় মার্গ সংগীত এবং চিত্রশিল্পে পারদর্শী। দুই পুত্র অঙ্কুর ও অর্পণ উচ্চশিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

২০১৪ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী শ্যামলকান্তি দাশ

জন্ম ১৯৫১ সালের ৩ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ড মেদিনীপুর জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রামে। বাবা পুরুষোত্তমপ্রসাদ দাশ, মা শেফালি দাশ। দুজনেই প্রয়াত। স্ত্রী শুক্লা দাশ।

শিক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহিষাদল রাজ কলেজ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (অসমাপ্ত)। কর্মজীবন শুরু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিক মাসিক 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায়। মধ্যে অল্প কিছুদিন মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা। পরে আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থায় যোগদান। প্রায় ২৮ বছর সাংবাদিকতার পর স্বেচ্ছা-অবসর। অতঃপর ২০০৪ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কবির কাগজ কবিতার কাগজ' মাসিক 'কবিসম্মেলন'। সম্পাদকের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বিশিষ্ট কবি ও গদ্যলেখকদের সৃষ্টিশীল অবদানে সমৃদ্ধ পত্রিকাটি তেরো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও সজীব এবং জনপ্রিয়তাও ক্রমবর্ধমান। ইতিমধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চির সবুজ লেখা' (পশ্চিমবঙ্গ শিশু কিশোর আকাদেমির মুখপত্র) পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় সাড়ে তিন বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় 'পাঠশালা' পত্রিকায়, ১৩৭২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। কবিতার নাম 'এই তো আমার পণ'।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কাগজকুচি', প্রকাশ পায় ১৯৭৬ সালে।

ছোটদের কবিতায়ও শ্যামলকান্তির নিজস্বতা ও উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। উপহার দিয়েছেন বেশকিছু অনবদ্য ছড়া। চমৎকার তাঁর ছন্দের জ্ঞান। বড়দের ও ছোটদের মিলিয়ে তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যা ৩৫। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কাগজকুচি', 'প্রেমের কবিতা', 'ভূতের চরণে', 'আমাদের কবিজন্ম', 'সরল কবিতা', 'ছোট শহরের হাওয়া', 'দূর থেকে লিখি', 'বোকা মেয়ের জন্য', 'চলে যায় দিন', 'পুলকিত যামিনী', 'একলা পাগল', 'নির্বাচিত কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। বাংলাদেশেও শ্যামলকান্তির জনপ্রিয়তার প্রমাণ সেখান থেকে প্রকাশিত 'স্বনির্বাচিত কবিতা', 'বন্ধুর মুখোশে বন্ধু', 'ভেসে বেড়াবার আনন্দ', 'ঝুপসি দিদির গানের বাড়ি', 'প্রিয় ১০০ কবিতা', ও 'ধানী পটকা' (বড়দের ছড়া)।

ছোটদের জন্য লেখা তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'বাবুইবাবু', 'চাইছি ঘুড়ি মাঞ্জা সুতো', 'পাতায় মোড়া বাঁশি', 'পাখি সব করে রব', 'বাঘের গায়ে হলদে জামা', 'শ্রেষ্ঠ ছড়া' এবং বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'আমপাতা জামপাতা' ও 'মনে কর ঘুমিয়ে আছিস'।

বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'কবিসম্মেলন' ছাড়াও তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রতীতি', 'জনপদ', 'কবিতা সংবাদ', 'কনসার্ট', 'আত্মজ' প্রভৃতি। সম্পাদিত নানা বিষয়ের বইয়ের সংখ্যা একশোরও বেশি। সম্পাদিক কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই : 'হাজার কবির হাজার কবিতা', 'বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'লেখক সত্যজিৎ রায়', 'আহ্লাদে আটখানা', 'দুই বাংলার প্রাণের কবিতা', 'দুই বাংলার আবৃত্তির কবিতা', '১০০ ছড়া ১০০ ছবি', 'ছোটদের আবৃত্তির কবিতা', 'চেনা সুনীল অচেনা সুনীল', 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়' প্রভৃতি।

কবি ও কবিতা নিয়ে নানারকম কাজে শ্যামলকান্তি সর্বদাই অক্লান্ত। সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও রয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল 'সৌহার্দ্য ৭০', 'সারা ভারত কবিতা উৎসব', 'বিশ্ব বাংলা কবিতা উৎসব', 'সারা বাংলা শিশু সাহিত্য উৎসব', 'সারা বাংলা তরুণ লেখক সম্মেলন' প্রভৃতি।

অজস্র সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত। তার মধ্যে রয়েছে: জীবনানন্দ পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, সাহিত্য সেতু পুরস্কার, তুষার রায় পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার, 'কিশোর ভারতী' পত্রিকার সাধনা চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার, লেখক সম্প্রীতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), সীমান্ত সাহিত্য পুরস্কার, নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদ সম্মাননা, আনন্দ মোসেম পুরস্কার (শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কৃষ্ণ' কবিতার জন্য), শিবরাম চক্রবর্তী স্মৃতি পুরস্কার (মালদহ), শিশু সাহিত্য পরিষদ পুরস্কার, তেপান্তর পুরস্কার, ডা. ওয়াজেদ স্মৃতি পুরস্কার (ঢাকা, বাংলাদেশ), আনিকা ইউসুফজাই স্মৃতি পুরস্কার (টাঙ্গাইল, বাংলাদেশ), ভারতীয় যুক্তিবাদী সমিতি পুরস্কার, ত্রিবৃত্ত পুরস্কার (কোচবিহার, দু-বার, কবিতা ও সম্পাদনার জন্য), কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র পুরস্কার ইত্যাদি।

২০০৯ সালে পেয়েছেন ভারত সরকার প্রদত্ত 'জাতীয় কবি'র সম্মান, গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে।

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত এবং বিদেশের বিভিন্ন সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শ্যামলকান্তির একাধিক কবিতা।

২০১৫ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা

অসমিয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-সমালোচক হরেকৃষ্ণ ডেকার জন্ম ১৯৪৩ সালে, উজান অসমের তিনসুকিয়ায়। মেধাবী ছাত্র হিসেবে পরিচিত হরেকৃষ্ণ ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর।

এরপর বছর তিনেক একটি কলেজে অধ্যাপনা করলেও শেষ পর্যন্ত অসম-মেঘালয় ক্যাডারের আইপিএস হয়ে অসমের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

পুলিশ-প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠান করেও হরেকৃষ্ণ ডেকা কবিতা থেকে কখনো দূরে থাকেননি। খুব ছোটবেলা থেকেই দৈনিক সংবাদপত্রে লেখালিখি করতেন। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'স্বরবর'। এরপর লিখেছেন 'রাতির শোভাযাত্রা', 'আন এজন', 'ভাল পোয়ার বাবে এযার', 'ছানমিয়ালি বর্ণমালা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। 'আন এজন' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৮৭ সালে পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

শুধু কবিতা নয়, হরেকৃষ্ণ ডেকা অসমিয়া সাহিত্যজগতে চিরকালের জন্য স্মরণযোগ্য নাম হিসেবে থেকে যাবেন ছোটগল্পের জন্যও। তাঁর ছয়টি ছোটগল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল 'প্রাকৃতিক আরু অনন্যা', 'মধুসূদনর দলং', 'বন্দিয়ার', 'পোস্ট-মডার্ন অথবা গল্প', 'মৃত্যুদণ্ড' এবং 'গল্প আরু কল্প'। 'বন্দিয়ার' গল্পগ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৯৬ সালে কথা পুরস্কার পেয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ ডেকার আলোচনাগ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। 'আধুনিকতাবাদ আরু অন্যান্য প্রবন্ধ', 'দৃষ্টি আরু সৃষ্টি', 'নীলমণি ফুকন : কবি আরু কবিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি অসমিয়া সাহিত্যের হালহকিকত নিয়ে নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া লিখেছেন দুটি উপন্যাস— 'আগন্তুক' ও 'তরুণ প্রজন্মর কবিতা'।

হরেকৃষ্ণ ডেকার লেখার মূল বৈশিষ্ট্য সমাজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। তাঁর যে-কোনো চরিত্রই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে আধুনিক সময়ের প্রতীক। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে সবসময় পরীক্ষানিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন তিনি।

সাহিত্য অকাদেমি ও কথা সাহিত্য পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন অসমিয়া সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান— অসম ভ্যালি লিটারারি অ্যাওয়ার্ড।

২০১৫ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী রত্নেশ্বর হাজরা

বাংলা কাব্যজগতে গত শতকের ছয়ের দশকের কবি রত্নেশ্বর হাজরার জন্ম অবিভক্ত ভারতের বরিশাল জেলার ভরতকাঠি গ্রামে, ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে। মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতৃহারা বালক বাঁধনহারা হয়ে লেখাপড়ায় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন।

১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গার অভিঘাতে উদ্‌বাস্তু হয়ে চলে আসেন কলকাতায়, আত্মীয়ের আশ্রয়ে শুরু হয় নতুন জীবন। স্কুলজীবন শেষ করে চাকরির উদ্দেশ্যে মোটর মেকানিজ্‌ম শিখতে শুরু করেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের থার্মোমিটার তৈরির একটা কারখানায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু দুটিই ছিল অসমাপ্ত। পরে কলকাতার আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে চাকরিতে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই অবসর।

কলেজ-জীবন থেকে কবিতাচর্চার শুরু। লিট্‌ল ম্যাগাজিন ছাড়া তখনকার 'ভারতবর্ষ' ও 'তরুণের স্বপ্ন' প্রভৃতি ঐতিহ্যশালী পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণঋতু' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে। এর পর একে একে প্রকাশিত হতে থাকে 'লোকায়ত অলৌকিক', 'জলবায়ু', 'গতকাল আজ এবং আমি', 'এদিকে দক্ষিণ', 'রাজি আছি', 'উপত্যকায় একা', 'আছি নির্বাসিত', 'নিজস্ব মানচিত্র', 'শেখানো ছবিগুলো', 'ধুলোস্নান' প্রভৃতি। লিখেছেন ছোটদের জন্য ছড়া/কবিতার বই— 'মেঘের দিদা বরফদানা', 'রত্নমালার যাদুকর', 'সবুজ পরিকে নেমন্তন্ন', 'মাটির ঘড়া স্বপ্নে ভরা', 'অলীকপুর একটু দূর' প্রভৃতি। অনুবাদ করেছেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' ও কালিদাসের 'ঋতুসংহার'। প্রকাশিত হয়েছে দুই খণ্ডে ছয়টি কাব্যনাটকের সংকলনও।

রত্নেশ্বর হাজরার কবিতায় আঙ্গিক-সচেতনতা, রহস্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, যতিচিহ্নহীনতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছোটদের জন্য লেখা কবিতায় পাওয়া যায় গ্রামবাংলার জলকাদার গন্ধ, শোনা যায় সুপুরিবাগানে ঘুঘুর উদাস-করা ডাক, ছবি হয়ে ওঠে বনপিপুল, অম্লবেতস, আমলকী, শতমূলী প্রভৃতি দৃশ্যের অনুষঙ্গ।

বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন কবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিজ্ঞান পুরস্কার, মহাদিগন্ত পুরস্কার, মঞ্জুষ দাশগুপ্ত স্মৃতি সম্মাননা, শিশুসাহিত্য পরিষদ পুরস্কার প্রভৃতি।

২০১৬ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী সনন্ত তাঁতি

আধুনিক অসমিয়া কবিতার নীরব সাধক সনন্ত তাঁতির জন্ম ১৯৫২ সালে, অসমের বাংলাদেশ-সংলগ্ন বরাক উপত্যকায় করিমগঞ্জ জেলার কালীনগর চা-বাগানে। ওড়িয়াভাষী চা-বাগান শ্রমিকের সন্তান সনন্ত নিকটবর্তী শহর রামকৃষ্ণনগরে বড় হয়ে ওঠেন। পরে শৈলশহর শিলঙে পড়াশোনা এবং ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ।

ছেলেবেলাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। স্বভাবতই এই ভাষার প্রেমে পড়েন, যা আজও অম্লান। তাঁর প্রথম রচনাও বাংলা ভাষায় লেখা একটি প্রেমের কবিতা। যৌবনে যোরহাটে বসবাসকালে তিনি অসমিয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে এই ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা উপলব্ধি করেন, যা অসমিয়া সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে এবং এই ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সনন্ত এমন একজন কবি যাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়া, শিক্ষা বাংলা মাধ্যমে আর কবিতা রচনা অসমিয়া ভাষায়— নিঃসন্দেহে এ এক বিরল কৃতিত্ব। সাম্যবাদী ভাবধারায় পুষ্ট তাঁর জীবন ও সংবেদনশীলতা আশির দশকে অসমের রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনগুলিতে তাঁর কবিতায় জুগিয়েছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

সনন্তের অসমিয়া কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তেরো। তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্য যেমন পাঠকের ভালোবাসা অর্জন করেছে তেমনই সমালোচকদের দ্বারাও উচ্চপ্রশংসিত। তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'উজ্জ্বল নক্ষত্রর সন্ধানত' প্রকাশ পায় ১৯৮১ সালে, চার বছর পরে বেরোয় দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মই মানুহর অমল উৎসব'। সনন্তের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'নিজর বিরুদ্ধে শেষ প্রস্তাব' (১৯৯০), 'শব্দত অথবা শব্দহীনতাত' (১৯৯৩), 'মৃত্যুর আগর স্টপেজত' (১৯৯৬), 'টেপনিতো কেতিয়াবা বারিষা আহে' (১৯৯৭), 'ধুঁয়া ছাইর সপোন' (১৯৯৯), 'দীর্ণ বসন্তর সৌরভ' (২০০২), 'আপুনি আপোনার স'তে যুদ্ধ করিব পারিবনে' (২০০৪), 'মই' (অর্থাৎ 'আমি', ২০০৮), 'মোর নিরাভরণ আত্মার শোকাবহ শব্দবোর' (২০১০), 'কাইলর দিনটো আমার হ'ব' (২০১৩)। গত মাসে (ফেব্রুআরি, ২০১৭) প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ত্রয়োদশ অসমিয়া কাব্যগ্রন্থ 'মোর প্রিয় সপোনর ওচরে-পাঁজরে' আর তাঁর কবিতার দিব্যজ্যোতি শর্মা কৃত ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ 'Selected Poems'.

সার্ক-ভুক্ত দেশগুলির লেখকদের সম্মেলন সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সনন্ত। তিনি ইতিমধ্যেই যে-সব পুরস্কারে ভূষিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯২ সালে অসম কবি সমাজ প্রদত্ত মৃণালিনী দেবী গোস্বামী পুরস্কার, ২০০২ সালে বীর বিরসা মুন্ডা পুরস্কার, ২০১১ সালে চর চাপোরি সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত ওসমান আলি সদাগর সমন্বয় পুরস্কার, ২০১৪ সালে ক্রান্তিকাল সম্মান, ২০১৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত নিজরা কবি শৈলধর রাজখোয়া পুরস্কার এবং ২০১৬ সালে এপিপিএল প্রদত্ত শিরিষ-অয়েল সাহিত্য পুরস্কার।

অসম সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন চা-শ্রমিকদের পেনশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ড সংক্রান্ত অর্ধ-সরকারি সংস্থা থেকে ২০১২ সালে ডেপুটি পিএফ কমিশনার হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন সনন্ত, তার পরও ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ওই সংস্থায় অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে কাজ করেছেন।

২০১৬ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী উদয়ন ঘোষ

জন্ম ১৯৪৩ সালে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন কেটেছে ইমফল, শিলচর, গুয়াহাটি আর শিলঙে। ছাত্রাবস্থা থেকেই কবিতা লেখেন উদয়ন, পরবর্তীকালে প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি অনুবাদও করেছেন। কর্মজীবন কেটেছে শিলং কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কিশোরীমোহন পাঠক আর পরশকুমার চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অল্পস্বল্প গবেষণাও করেছেন।

বর্তমানে কলকাতা নিবাসী উদয়ন একসময়ে শিলচরের বিখ্যাত কবিতা-পত্রিকা 'অতন্দ্র'-র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন ১৯ বছর। যখন যেখানে থাকেন সেখানেই ঘনিষ্ঠজনদের সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা তাঁর অন্যতম নেশা। মার্ক্সবাদী রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব ভাষার নির্বাচিত কবিতা সংকলন করে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, সংকলনটি সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশ পাবে। উদয়নের কিছু-কিছু অনুবাদ পেঙ্গুইন-এর এক সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে উদয়নের যে-সব বই প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ঝোপ জঙ্গলের কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'কমলকুমার বোধিনী-১', 'হরিশ্চন্দ্র' (বনসাই উপন্যাস) আর 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোর দেড়শো বছর'। তাঁর অন্য যে-সব গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় তার মধ্যে রয়েছে 'অর্কিড উপত্যকার ভালোবাসার গান', 'নাগা পাহাড়ের গান', 'পয়েন্টেলিস্টের আত্মকথা', 'কমলকুমার বোধিনী-২', 'উড়ো কবিতার ঝুড়ো ফুল', সংলাপ কাব্য 'রক্ত সিংহাসন' ও 'ব্ল্যাকহোল রেডিয়েশন', প্রবন্ধ সংকলন 'একথা, ওকথা, মাতকথা' এবং 'সলোমনের গান'।

হাইলাকান্দির 'সাহিত্য' পত্রিকার পক্ষ থেকে সম্মান লাভ করেছেন ২০০৭ সালে।

২০১৭ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী সমীর তাঁতী

কবি সমীর তাঁতীর জন্ম বেহোরা চা বাগানের মিকিরচাঙে, ১৯৫৫ সালে। স্থানীয় রাজবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন প্রথম বিভাগে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের পড়াশোনা করার সময় তাঁর পরিচয় ঘটে অসমিয়া সাহিত্যের দিক্‌পাল হীরেন গোহাঁই, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও গোবিন্দপ্রসাদ শর্মার সঙ্গে। যাঁরা ছিলেন তাঁর শিক্ষক।

সমীর তাঁতী কর্মজীবন শুরু করেন 'সাদিনিয়া নাগরিক' কাগজে সহকারী সম্পাদক রূপে। যাঁর সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক হোমেন বরগোহাঞি। সেই সময় প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে'।

এর পর দুর্গেশ্বর দত্ত নিয়মিত সমীর তাঁতীর কবিতা প্রকাশ করতেন তাঁর পত্রিকা 'পান্থদীপ'-এ। কর্মজীবনে থিতু হওয়ার আগে সমীর তাঁতী কাজ করেছেন চাংসারির শরাইঘাট কলেজে লেকচারার হিসেবে, খানাপাড়ার গণেশ মন্দির বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে, অসম সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অনুবাদক রূপে, দেড় বছর কাজ করেছেন ইংরেজি 'দ্য সেন্টিনেল' পত্রিকায় প্রুফরিডার হিসেবে। ১৯৮৪ সালে যোগ দেন অসম সরকারের পর্যটন বিভাগে। এবং সেখান থেকেই ২০১৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে।

এ-যাবৎ সমীর তাঁতীর তেরোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ-ছাড়া রয়েছে সাহিত্য ও সমালোচনামূলক চারটি গ্রন্থ, আফ্রিকার কবিতা ও প্রেমের গান এবং জাপানের ভালোবাসার কবিতা নামক দুটি অনুবাদ গ্রন্থ, দুটি সম্পাদিত ছোটগল্প সংকলন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল 'যুদ্ধভূমির কবিতা' (১৯৮৫), 'কদম ফুলর রাতি' (২০০১), 'শোকাকুল উপত্যকা' (১৯৯০), 'সময় শব্দ সপোন' (১৯৯৬) প্রভৃতি।

২০১২ সালে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় মর্যাদাসম্পন্ন আসাম ভ্যালি লিটারারি অ্যাওয়ার্ড। ছগনলাল জৈন সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাদেমি কর্তৃক সংবর্ধিত সমীর তাঁতী ১৯৮৭ সালে অংশগ্রহণ করেন ভূপালে আয়োজিত ইন্ডিয়ান পোয়েট্রির প্রথম অধিবেশনে। ভূপাল সহ দেশের বিভিন্ন শহরে তিনি যোগ দিয়েছেন সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা, নতুন দিল্লি, পাটনা, মুম্বাই, কোচি, ভুবনেশ্বর, কোণার্ক প্রভৃতি শহর।

২০১৭ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী অজিত বাইরী

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কনকপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালের ৭ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন কবি অজিত বাইরী। স্কুল-হোস্টেলে মাঝরাতে লণ্ঠনের আলোয় প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন অকালপ্রয়াত মায়ের স্মৃতিতে।

কৈশোরোত্তীর্ণ দিনগুলিতে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল কারখানার ফাইফরমাস খাটার কর্মী ও পরে হাওড়া স্টেশনে কুলি-কামিনদের রেশনের মাল খালাসের হিসাবরক্ষক হিসেবে। ১৯৭১-এ সরকারি চাকরিতে যোগ দেন তিনি। ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের উপ-প্রকল্প অধিকর্তা (কৃষি) পদ থেকে অবসরগ্রহণ।

নকশাল আন্দোলনের সময়ে তিনি ছিলেন পুলিশের চোখে সন্দেহভাজন। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন কবি-সাংবাদিক জ্যোতির্ময় দত্তকে স্বগৃহে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হতে হয় কবি অজিত বাইরীকে।

অজিত বাইরীর এ-যাবৎ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ২৬টি, উপন্যাস দুটি, গল্প সংকলন একটি, স্বরচিত কবিতার আলোচনাগ্রন্থ একটি, আত্মকথামূলক গদ্যগ্রন্থ একটি, দুই বাংলার কবিদের নিয়ে এবং অন্যান্য সম্পাদিত কবিতার সংকলন সাতটি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হলো 'রাঢ়ের মাটি, দক্ষিণের নোনা হাওয়া', 'বিদায় কোভালাম বিদায় সূর্যাস্ত', 'প্রিজনভ্যান এবং কালপুরুষ', 'হরীতকী বনের রোদ', 'সন্ধ্যাতারার মতো মেয়েটি', 'আগুনের চাদর', 'শব্দের টেরাকোটা', 'ধুলো থেকে তুলে নেব স্তব', 'পরিব্রাজকের ঝুলি', 'অর্ধেক আকাশ তুমি', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রভৃতি। সম্পাদিত পত্রিকা : প্রতিমুখ (১৯৮০-১৯৮৬), কৃত্তিকা (২০০৮-২০১০)।

কবি ও প্রাবন্ধিক তপনকুমার মাইতি সম্পাদিত 'সির্জন নদীর কবি : অজিত বাইরী' গ্রন্থে কবির কাব্যের মূল্যায়ন করেছেন অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলরতন সেন, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক।

কবিতার পাশাপাশি অজিত বাইরী একজন কৃষি বিশেষজ্ঞ। চাকরিসূত্রে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল। নোনা ভূমিতে আধুনিক কৃষিকর্ম কীভাবে করা যায় সেসব হাতেকলমে তিনি শিখিয়েছেন কৃষকদের।

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য

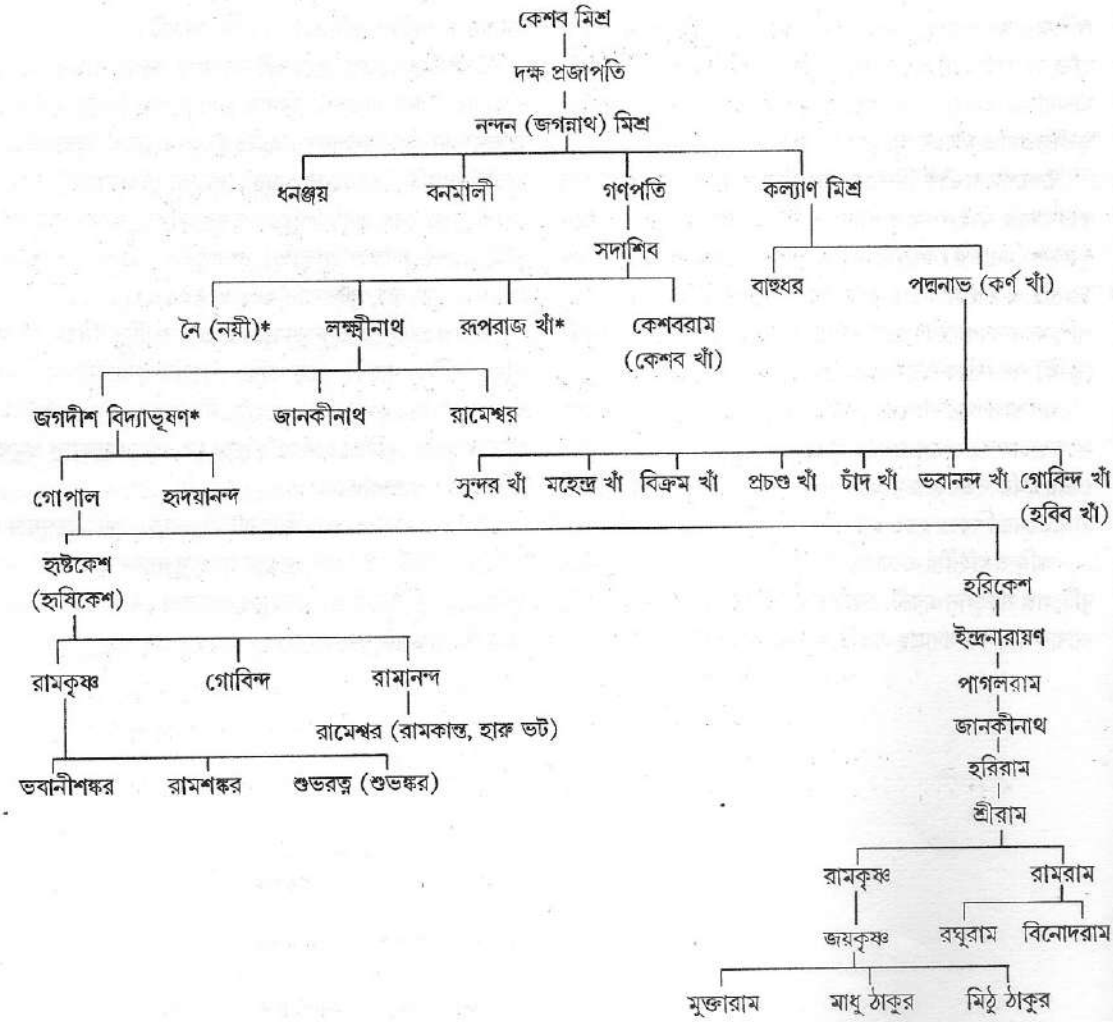

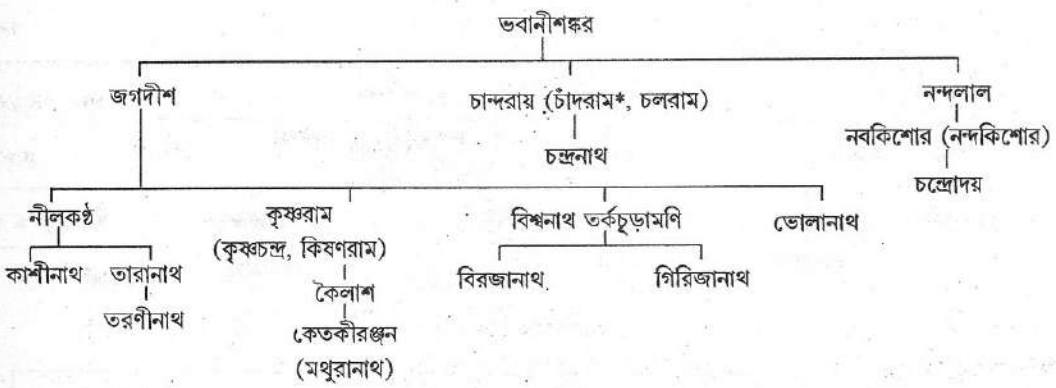
ভবানীশঙ্কর
জগদীশ
চান্দরায় (চাঁদরাম*, চলরাম)
চন্দ্রনাথ
নন্দলাল
নবকিশোর (নন্দকিশোর)
চন্দ্রোদয়
নীলকণ্ঠ
কাশীনাথ
তারানাথ
তরণীনাথ
কৃষ্ণরাম
(কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
কৈলাশ
কেতকীরঞ্জন
(মথুরানাথ)
বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি
বিরজানাথ
গিরিজানাথ
ভোলানাথ

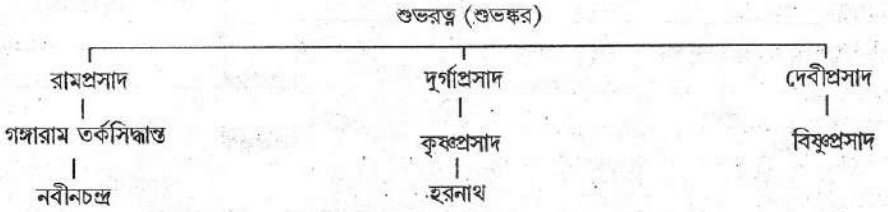
শুভরত্ন (শুভঙ্কর)
রামপ্রসাদ
গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত
নবীনচন্দ্র
দুর্গাপ্রসাদ
কৃষ্ণপ্রসাদ
হরনাথ
দেবীপ্রসাদ
বিষ্ণুপ্রসাদ

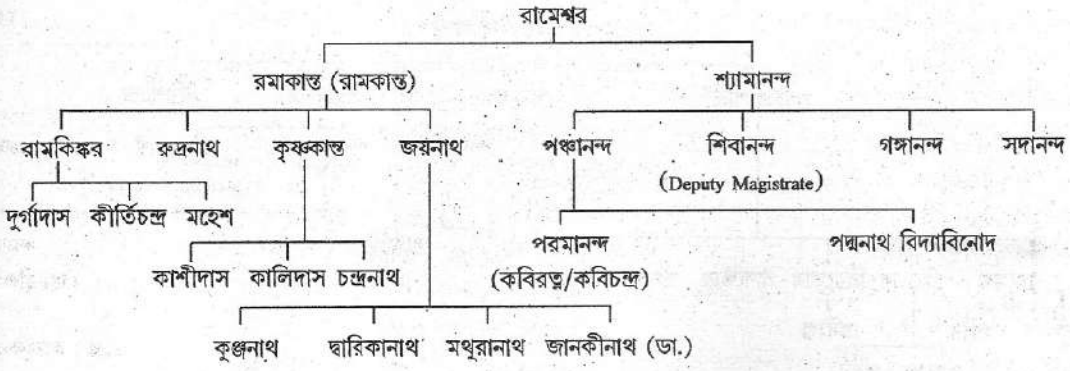
রামেশ্বর
রমাকান্ত (রামকান্ত)
শ্যামানন্দ
রামকিঙ্কর
রুদ্রনাথ
কৃষ্ণকান্ত
জয়নাথ
পঞ্চানন্দ
শিবানন্দ
(Deputy Magistrate)
গঙ্গানন্দ
সদানন্দ
দুর্গাদাস
কীর্তিচন্দ্র
মহেশ
পরমানন্দ
(কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
কাশীদাস
কালিদাস চন্দ্রনাথ
কুঞ্জনাথ
দ্বারিকানাথ
মথুরানাথ
জানকীনাথ (ডা.)

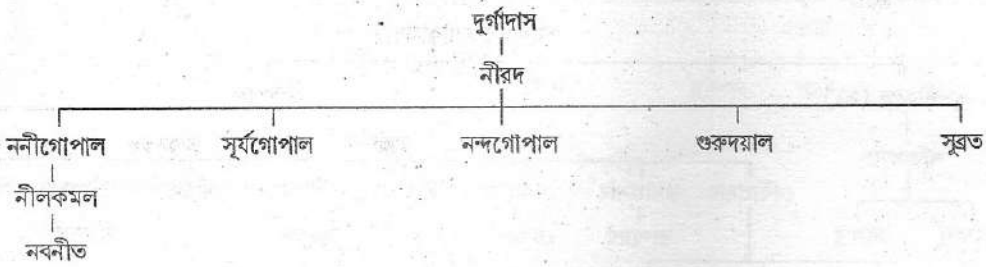
দুর্গাদাস
নীরদ
ননীগোপাল
নীলকমল
নবনীত
সূর্যগোপাল
নন্দগোপাল
গুরুদয়াল
সুব্রত

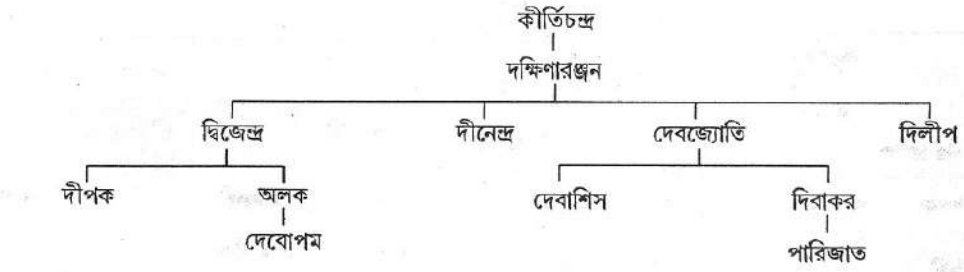

জানকীনাথ (ডা.)

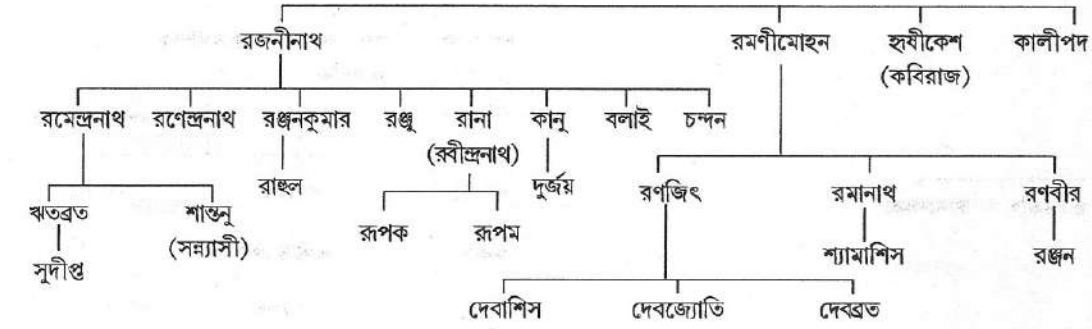

পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)

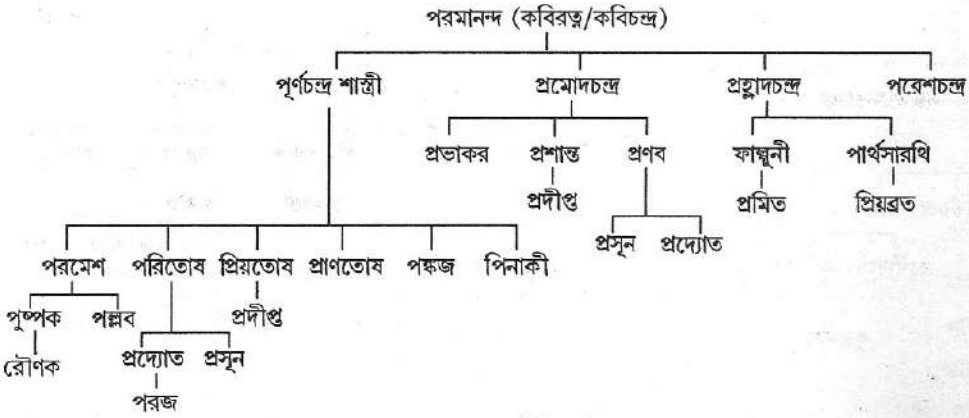

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ

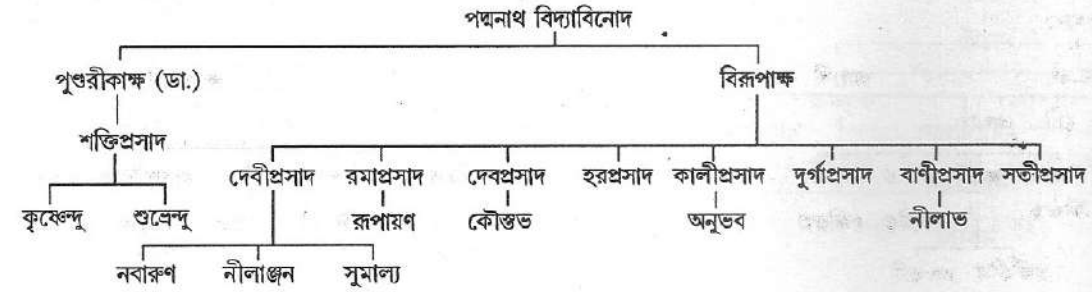

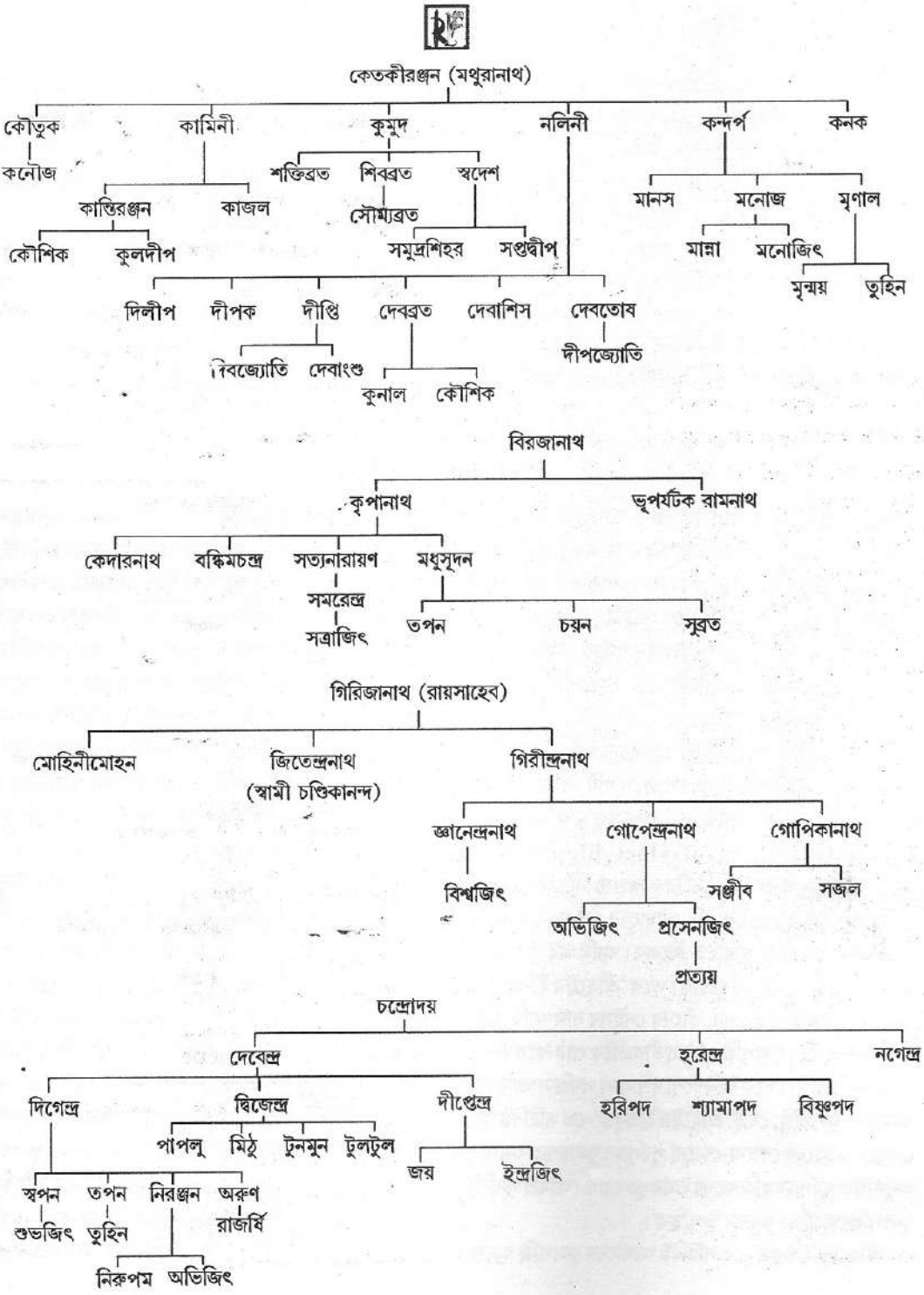
কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
কৌতুক
কনৌজ
কামিনী
কান্তিরঞ্জন
কৌশিক
কুলদীপ
কাজল
কুমুদ
শক্তিব্রত
শিবব্রত
স্বদেশ
সৌম্যব্রত
সমুদ্রশিহর
সপ্তদ্বীপ
নলিনী
কন্দর্প
মানস
মনোজ
মৃণাল
মান্না
মনোজিৎ
মৃন্ময়
তুহিন
কনক
দিলীপ
দীপক
দীপ্তি
দেবব্রত
দেবাশিস
দেবতোষ
দীপজ্যোতি
বিজ্যোতি
দেবাংশু
কুনাল
কৌশিক
বিরজানাথ
কৃপানাথ
ভূপর্যটক রামনাথ
কেদারনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনারায়ণ
মধুসূদন
সমরেন্দ্র
সত্রাজিৎ
তপন
চয়ন
সুব্রত
গিরিজানাথ (রায়সাহেব)
মোহিনীমোহন
জিতেন্দ্রনাথ
(স্বামী চণ্ডিকানন্দ)
গিরীন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বিশ্বজিৎ
গোপেন্দ্রনাথ
অভিজিৎ
প্রসেনজিৎ
প্রত্যয়
গোপিকানাথ
সঞ্জীব
সজল
চন্দ্রোদয়
দেবেন্দ্র
দিগেন্দ্র
স্বপন
শুভজিৎ
তপন
তুহিন
নিরঞ্জন
নিরুপম
অভিজিৎ
অরুণ
রাজর্ষি
দ্বিজেন্দ্র
পাপলু
মিঠু
টুনমুন
টুলটুল
দীপ্তেন্দ্র
জয়
ইন্দ্রজিৎ
হরেন্দ্র
হরিপদ
শ্যামাপদ
বিষ্ণুপদ
নগেন্দ্র

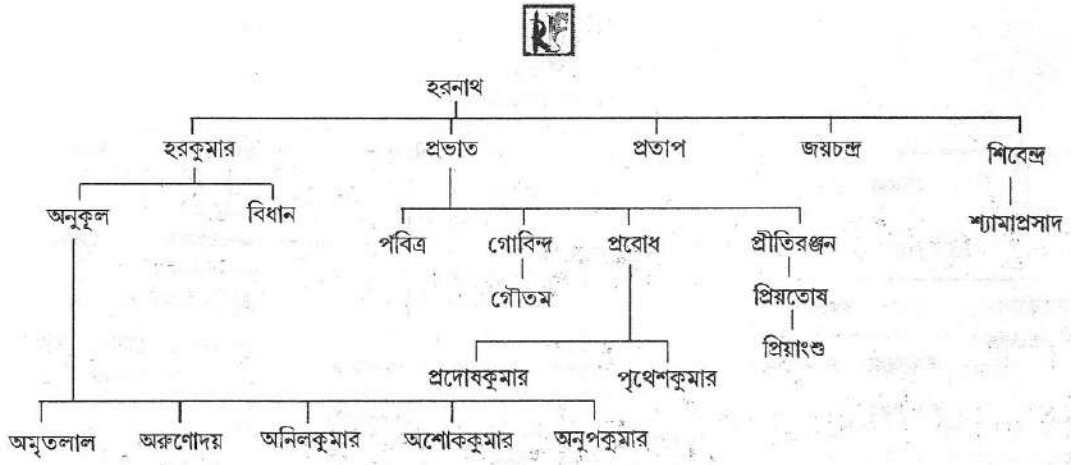

সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় 'উৎস' সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সন্নিবিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি ('বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ')। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সন্নিবিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsylhet_blogspot.com ওয়েবসাইটে— এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা স্বনামে উপস্থিত।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাগুক্ত অন্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেষোক্ত নামেই উপস্থিত। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'রমাকান্ত' রামকান্ত নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুদূর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে : আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি 'গোপেন্দ্র' দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো 'তপন' শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচঙে এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি

শ্রদ্ধাস্পদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটিবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্তু) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তার কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয় বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, কুলপঞ্জিটি ইতিপূর্বে ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছিল, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। অবশ্য দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়!

তবে ২০১৬ সালের জানুআরি মাসে আমাদের পূর্বপুরুষ প্রভাত বিশ্বাসের পৌত্র শ্রী প্রদোষকুমার বিশ্বাস (যিনি বর্তমানে কোচবিহারবাসী এবং সম্পর্কে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র) সহ তাঁর অনুজ পৃথ্বেশকুমার, জ্যাঠতুতো ভাই গৌতম, খুড়তুতো ভাই প্রিয়তোষ ও তস্য পুত্র প্রিয়াংশুর নাম ফাউন্ডেশনের স্মারকগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য এসএমএস করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। শ্রীমান প্রদোষ নিজেই আমার ফোন নম্বর জোগাড় করে যোগাযোগের পথ খুলে দিয়েছেন। এ বড় আহ্লাদের কথা। বলা বাহুল্য, উক্ত তথ্য কুলপঞ্জিতে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তা ছাড়া, দেশবিভাগ-জনিত কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আমার স্বর্গত জ্যেষ্ঠতাত রজনীনাথ ভট্টাচার্যের কয়েকজন উত্তরপুরুষের নাম বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিতে ইতিপূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়নি। বানিয়াচং বিদ্যাভূষণপাড়া নিবাসী আমার অনুজ জ্ঞাতি শ্রী শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস ব্যাকরণতীর্থের প্রচেষ্টায় নামগুলি সঠিকভাবে উদ্ধার করা গেছে এবং ২০১৭ সাল থেকে কুলপঞ্জিতে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। ❑

মতামত

From: Prithwish Deshamukhya
4, Sunny Apartment
P.O. Ambikapatty, Silchar
Dist. Cachar, Assam
Pin: 788004
Mobile: 9854982582

শ্রদ্ধেয় রমানাথবাবু,

আপনার পাঠানো স্মারকগ্রন্থ আমি নিয়মিত পেয়ে যাচ্ছি। স্মারকগ্রন্থগুলি বছর বছর আরো আকর্ষক হচ্ছে। এবারের গ্রন্থটি তো অনবদ্য। গ্রন্থটির সার্বিক উপস্থাপন প্রশংসার যোগ্য। দুটি স্মারক বক্তৃতা— নগেন শইকীয়ার 'অসমিয়া গদ্যের বিবর্তন' এবং তরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা গদ্যকবিতার রূপ-রূপান্তর' গবেষণাধর্মী রচনা। এগুলি সাহিত্যসম্পদে সমৃদ্ধ এবং এতে অনেক ভাবনার খোরাক আছে। পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের 'মোসলমান নাম তত্ত্ব' এবং রামনাথ বিশ্বাসের 'ভারত ভ্রমণ' অতীত থেকে দুটি উজ্জ্বল উদ্ধার। 'মোসলমান নাম তত্ত্ব' উৎকৃষ্ট রচনা, কিন্তু সংক্ষিপ্ত বলে অতৃপ্তি থেকে যায়।

রামনাথ বিশ্বাস লা-জবাব। রামনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণকাহিনি পড়েননি এমন শিক্ষিত বাঙালি কজন আছেন? আমাদের ছোটবেলায় যখন টিভি রেডিয়ো ছিল না তখন বঙ্কিম-শরতের উপন্যাস, মোহন সিরিজ, রামনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। তখন এগুলি ছিল আমাদের অবসর বিনোদনের খোরাক। রামনাথ বিশ্বাসের ভ্রমণকাহিনি পড়ে আমাদের মনে বিপুল সুদূরের বাঁশরী বেজে উঠত। বড় হয়ে তাঁর মতো উদ্দাম, বন্ধনহীন জীবনে ভ্রমণ করার স্বপ্ন দেখতাম। আমার এখনও মনে আছে, সম্ভবত কোনো একজন চিনা তাঁর নাম উচ্চারণ করেছিল 'লিমনাথ বিস্‌ওয়াসি' বলে। তখনকার দিনে সাইকেলের দুই চাকায় ভর করে বিশ্বভ্রমণ চাট্টিখানি কথা নয়। পূর্বপুরুষের সেই চাকাই যেন আপনার 'লুইতের পদাবলী' গ্রন্থের একটি কবিতায় অন্য এক প্রেক্ষিতে, অন্য এক অনুষঙ্গে এসে গেছে —

দিনভর রাতভর চাকা আমরা
সভ্যতা ঘুমিয়ে যাচ্ছে
ডুবে যাচ্ছি ডুবে যাচ্ছি আমরা...

আপনার সুযোগ্য সন্তান শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে।

শুভেচ্ছান্তে —

১০.০৬.২০১৭ ইং
শিলচর, অসম

পৃথ্বীশ দেশমুখ্য
ফোন: ৯৮৫৪৯৮২৫৮২